শরীয়াহর জন্যই আমরা

দ্বি-মাসিক

শরীয়ত

মে, জুন ২০১৫ ইং, প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা-২

نحن للشريعة فداء



দ্বি-মাসিক
শরীয়ত
মে, জুন ২০১৫ ইং, প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা-২

পত্রিকার মূল্য ঃ ৪০ টাকা

যোগাযোগ ঃ
muftihasanimtiaz@yahoo.com
www.shoriotmagazine.wordpress.com
বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচি



তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান চায়?

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

অর্থ: 'তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধানদানকারী? (সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৫০)

ইমাম তবারী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك، فلم يرضوا بحكمك، إذ حكمت فيهم بالقسط "حكم الجاهلية"، يعني: أحكام عبَدة الأوثان من أهل الشرك، وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم، وأنه الحق الذي لا يجوزُ خلافه.

ثم قال تعالى ذكره= موبِّخا لهؤلاء الذين أبوا قَبُول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ولهم من اليهود، ومستجهلا فعلَهم ذلك منهم=: وَمَنْ هذا الذي هو أحسن حكمًا، أيها اليهود، من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله، ويقرُّ بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أيّ حكم أحسن من حكم الله، إن كنتم موقنين أن لكم ربًّا، وكنتم أهل توحيدٍ وإقرار به؟

'আল্লাহ তাআলা বলছেন, এ সকল ইহুদী যারা আপনার কাছে বিচার দায়ের করে, অতঃপর আপনি যখন তাদের মাঝে ন্যায় ফায়সালা করেন, তারা আপনার ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়। এরা কি 'জাহিলিয়্যাতের বিধান' কামনা করে? অর্থাৎ মুশরিক মূর্তিপুজারীদের বিধান কামনা করে? অথচ তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। আপনি তাদের মাঝে যে ফায়সালা করেছেন তার সততা তাতে বিদ্যমান আছে। আর এটাই হক্ব যার বিপরীত সব কিছু অবৈধ।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা পক্ষে-বিপক্ষে হবার কারণে ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা তা মানতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভর্ৎসনা করছেন এবং তাদের উক্ত কাজকে জাহিলিয়্যাত আখ্যায়িত করে বলেছেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! যারা আল্লাহ তাআলার ওয়াহদানিয়্যাতে বিশ্বাসী, যারা তার রুবূবিয়্যাতকে স্বীকার করে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার চেয়ে আর কে আছে উত্তম বিধানদানকারী।

আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা যদি বিশ্বাস করো তোমাদের একজন রব আছেন, তোমরা তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস করো, মুখে তার স্বীকারোক্তি দাও, তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কী হতে পারে?!' (তাফসীরে তবারী, খন্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩৯৪)

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন,

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي حكم البشر للبشر ، لأنها هي عبودية البشر للبشر ، والخروج من عبودية الله ، ورفض ألوهية الله ، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .

إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع يوجد بالأمس ، ويوجد اليوم ، ويوجد غداً ، فيأخذ صفة الجاهلية ، المقابلة للإسلام ، والمناقضة للإسلام . والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليماً ، فهم إذن في دين الله . وإما إنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته ، وليسوا بحال في دين الله . والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية ، ويعيش في الجاهلية .

...جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها. وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير[تفسير ابن كثير[

... চেঙ্গিস খানই "ইয়াসিক" নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হলো ইসলামী, ইহুদী ও খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন শরীয়াতের মিশ্রণে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। আর সেটাই তার সম্প্রদায়ের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে। ইয়াসিককে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর দিকে ফিরে না আসে এবং কম হোক বেশি হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩১)

নির্দেশনা:

আমরা উক্ত আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত দেখতে পেলাম। তাদের ব্যাখ্যা জানতে পারলাম। আমরা আমাদের সমাজে পরিচালিত শাসনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি, এটা কি নব্য জাহিলিয়্যাত নয়?! পাঠকগণকে অনুরোধ করবো তারা যেন ইতিহাস থেকে তাতারদের সংবিধান সম্পর্কে জেনে নেয়। নিশ্চয়ই তারা বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে প্রচলিত সংবিধান সেই ইয়াসিকের চেয়েও জঘন্য, নিকৃষ্ট। কেননা ইয়াসিকের মাঝে তো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে ও তার শাস্তি বিধান করা হয়েছে; কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মানব রচিত সংবিধানগুলো তো অনেক অপরাধকে অপরাধ বলেই স্বীকার করা হয়নি; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তো অপরাধকে ভালো কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইয়াসিকের ব্যাপারে যদি তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের অভিমত এমনটি হয়, তাহলে বর্তমান সংবিধান রচনাকারীদের ব্যাপারে অভিমত কী হতে পারে?! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

'এই নসের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বর্ণনা ও তাঁর কুরআনের সংজ্ঞা অনুযায়ী জাহিলিয়্যাত বলা হয়, মানুষের জন্য তৈরী মানুষের বিধানকে। কেননা এটা মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্ব, আল্লাহ তাআলার দাসত্বকে বর্জন। তাঁর উলুহিয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান এবং প্রত্যাখ্যানের পর তাঁর মোকাবেলায় কতক মানুষের উলুহিয়্যাতকে গ্রহণ। আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তাদের দাসত্বের সামনে আত্মসমর্পণ।

এই নসের আলোকে বোঝা যায়, জাহিলিয়্যাত কোন এক সময়ের নাম নয়। জাহিলিয়্যাত হলো, এক ধরনের উদ্ভাবন ও প্রণয়নের নাম। যা বর্তমানে বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকবে। যা আসে ইসলামের মোকাবেলায়, যার সাথে থাকে ইসলামের বৈপরীত্ব।

মানুষরা যে সময়ে বা যে স্থানে অবস্থান করুক, হয়তো সে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে, (তাঁর কিছু বিধান থেকে বিরত থাকা ব্যতীত) তা গ্রহণ করবে। পরিপূর্ণভাবে তার সামনে আত্মসমর্পণ করবে। তাহলেই তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে আছে বলে গণ্য হবে। আর হয়তো তারা মানব রচিত সংবিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে (তা যাই হোক না কেন) তা গ্রহণ করে নেবে, তাহলে তারা জাহিলিয়্যাতের মাঝে আছে বলে পরিগণিত হবে। তাদেরকে তার দীনের মাঝে গণ্য করা হবে যার শরীয়ত দ্বারা তারা বিচার ফায়সালা করছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দীনের অনুসারী বলা হবে না। যে আল্লাহর বিধান কামনা করে না সে-ই জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে, যে আল্লাহর শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে সে-ই জাহিলিয়্যাতের শরীয়তকে গ্রহণ করে ও তা অনুযায়ী জীবন যাপন করে।' (তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৪)

এমনকি তিনি আরো বলেন:

إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين . .

'হয়তো ইসলাম নয়তো জাহিলিয়্যাত। হয়তো ঈমান নয়তো কুফর। হয়তো আল্লাহর হুকুম নয়তো জাহিলিয়্যাতের বিধান। আর যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের, জালিম, ফাসেক। যে সমস্ত বিচারপ্রার্থীরা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে না তারা মুমিন নয়। (তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৫)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাতারদের নিয়ে আলোচনা করেন। তারা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করেছিল সে কথা উল্লেখ করে বলেন,

দারসুল হাদীস



তায়েফাতুল মানসূরা: সাহায্যপ্রাপ্ত দলের পরিচয়

ইসলামের নামে যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে নানা মত ও পথের অসংখ্য ফেরকা বা গোষ্ঠির। প্রত্যেকেই নিজেদের দল-মত-পথকে সঠিক মনে করে। প্রত্যেকেই দাবি করে, মানবতার মুক্তি ও আল্লাহর সাহায্য তাদের হাত ধরেই আসবে, অন্য কারো মাধ্যমে নয়। অথচ হকের সাথে তাদের না আছে দূরতম কোন সম্পর্ক আর না তাদের কর্মপদ্ধতির সাথে নববী আদর্শ ও সালাফের অনুসৃত পথের রয়েছে কোন যোগসূত্র। ফলশ্রুতিতে যা হবার তাই হচ্ছে। বিকৃত কিংবা ত্রুটিপূর্ণ বোধ-বিশ্বাস মানুষের মাঝে দলাদলি আর হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। মানুষের সামনে হকের মানদণ্ড অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ফলে তারা নানা মত ও দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কাছে না আছে কোন দলিল না কোন যৌক্তক কারণ।

ফেরকাবাজি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নিজেরাই নিজেদের চরম জাতশত্রুতে পরিণত হয়েছে। অন্য দিকে, বিভিন্ন মত ও পথের ধ্বজাধারীদের কাঁদা ছোড়াছোড়ির ফলে সাধারণ মানুষ সমকালীন সকল দল ও জামাতকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে –সঠিক আর ভ্রান্ত বাছ বিচার ছাড়াই। আর এ যুক্তিতে তারা কোন দলের সমর্থক বা অনুসারী হওয়ার গরজ অনুভব করছে না। অথচ, সঠিক যারা অবশ্যই তাদের সমর্থন করতে হবে।

প্রিয় নবী সা. কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনাগত উম্মাহর জন্য 'উম্মাহর কল্যাণে সদা তৎপর' সে দলটির পরিচয় দিয়ে গেছেন। যেন উম্মাহ তাদের পরিচয় পেয়ে তাদের অনুসরণ করতে পারে। তাদের দল ভারী করতে পারে। কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি যে দল ভারী করবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড সর্মথন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অন্য হাদীসে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়কে ভালবাসে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের দলভুক্ত করবেন। আসুন সাহায্যপ্রাপ্ত সে দলটির গুণাবলি প্রিয় নবীর হাদীসের আলোকে জেনে নিই। আল্লাহ আমাদের সে দলের অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

তায়েফায়ে মানসূরা তথা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের পরিচয়, ফযিলত এবং তাদের অনুসরণের ব্যাপারে হাদীসের কিতাবসমূহে কাছাকাছি অর্থের অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল যেগুলোর অর্থ কাছাকাছি হলেও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কিছু নির্দেশ করে।

وعن عمران بن هانئ قال: سمعت معاوية على المنبر يقول: سمعت رسول الله يقول:" لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ".

১. হযরত ইমরান ইবনে হানী রাযি. বলেন, আমি হযরত মুয়াবিয়া রাযি.কে মিম্বারের উপড় দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর নির্দেশের উপর অটল থাকবে। তাদের বিরোধিতাকারীরা কিংবা তাদের অবজ্ঞাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি একসময় আল্লাহর নির্দেশ তথা কেয়ামত এসে পড়বে, অথচ তারা মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে। - বুখারী, মুসলিম

وعن سلمة بن نفيل الكندي، قال: كنت جالساً عند رسول الله ، فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها! فأقبل رسول الله بوجهه وقال:"كذبوا، الآن، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم، حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ".

২. হযরত সালামা ইবনে নুফাইল রাযি. থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. এর কাছে বসেছিলাম; তখন এক ব্যক্তি রাসূল সা.কে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা ঘোড়ার প্রতি উদাসীনতা দেখাচ্ছে, অস্ত্র রেখে দিয়েছে আর

বলছে, এখন আর জিহাদের প্রয়োজন নেই। যুদ্ধের পাঠ চুকে গেছে। তখন রাসূল সা. লোকদের প্রতি লক্ষ করে বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে। সবেমাত্র না যুদ্ধের সময় হল। আমার উম্মতের একদল সত্যের পক্ষে লড়তে থাকবে। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে অনেক গোত্রের অন্তর কম্পমান করে দিবেন। আর তাদের থেকে আল্লাহ তাদের রিযিক দিবেন। এমনকি কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং আল্লাহর ওয়াদা এসে উপস্থিত হবে। ঘোড়ার ললাটে কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। - নাসায়ী

وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله:" لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة ".

৩. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররাহ রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমার উম্মতের একদল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। - ইবনে মাজাহ

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله:" لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق،ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال ".

৪. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের পথে কিতাল করবে। তারা তাদের শত্রুদের উপর সর্বদা জয়ী থাকবে। এমনকি তাদের শেষাংশ দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে।

এ ধরণের আরো অনেক হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা যা বুঝতে পারি–

* এমন কোন কাল অতিক্রম হবে না যখন পৃথিবীর কোন প্রান্তে আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য জিহাদরত কোন দল পাওয়া যাবে না। কোথাও না কোথাও অবশ্যই তেমন একটা দল থাকবে ।

* কোন শক্তি তাদের দমাতে পারবে না। চাই সে শক্তি কোন কুফরী পরাশক্তি নামেই আবির্ভূত হোক বা কুফ্ফারদের দালাল নামধারী মুসলিম শক্তিই হোক না কেন। এর উদাহরণ দেওয়াই বাহুল্য। ইতিহাস এর নির্মম সাক্ষী। আজ অবধি যত বড় বড় কুফরী শক্তির পরাজয় হয়েছে অধিকাংশই তাদের তুলনায় মুষ্টিময় মুসলমানদের হাতেই হয়েছে। তাদের সাথে মোকবেলা করে কোন শক্তিই টিকে থাকতে পারবে না।

* তাদের শেষাংশ দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে। দাজ্জাল হল কুফরী শক্তির সবচেয়ে বৃহৎ এবং চূড়ান্ত শক্তি। এই মহাশক্তির পরাজয়ও তাদের হাতে হবে। এত বড় কুফরী শক্তির যদি তাদের হতে পরাজিত হতে হয়, তাহলে অন্য কোন কুফরী শক্তি তাদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারে।

* আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় তাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে। এখানে আল্লাহর হুকুম বলতে মৃদু বাতাসের মাধ্যমে মুমিনদের রুহ কবজ করে নেওয়া পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন এক হাদীসে এসেছে,

وعن عبد الرحمن بن شُمَاسَة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلَّد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله ﷺ يقول:" لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك "، فقال عبد الله: أجل ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة " مسلم.

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শুমাসা রহ. বলেন, আমি মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ রহ. এর কাছে বসা ছিলাম। তার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসও ছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ রাযি. বললেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে জাহেলিয়্যাতের যুগের মানুষের চেয়েও নিকৃষ্টদের উপর। তারা কোন দোয়া করলে আল্লাহ তা ফিরিয়ে দিবেন। এমন সময় তাদের মাঝে উকবা ইবনে আমের রাযি. প্রবেশ করলেন। তখন তাকে উদ্দেশ্য করে মাসলামা রাযি. বললেন, হে উকবা, দেখ তো আব্দুল্লাহ কী বলছে? তখন উকবা রাযি. বললেন, তিনি ভালই জানেন। তবে আমি রাসূল সা.কেবলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের পথে লড়তে থাকবে, তারা তাদের শত্রুদের ব্যাপারে অনেক কঠোর হবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে আর তারা তাদের অবস্থায় অটল থাকবে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বললেন, হ্যাঁ, এমনই। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মৃদু বাতাস প্রবাহিত করবেন; যার ঘ্রাণ হবে মেশকের মত আর কোমলতা হবে রেশমী কাপড়ের মত। যার অন্তরে শরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে সে বাতাস তাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবে। অতঃপর রয়ে যাবে সৃষ্টির সবচেয়ে ঘৃণিত জাতি। আর তদের উপরই কেয়ামত সংঘটিত হবে। -মুসলিম

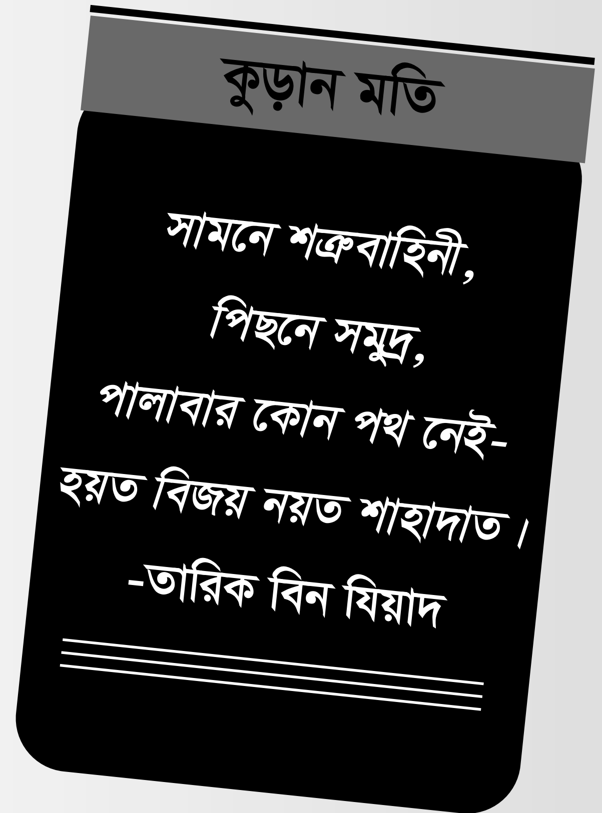
উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তারাই তায়েফায়ে মানসূরা। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরেও প্রত্যেকে নিজেদেরকে -মুজাহিদীনদের কাতারে শামিল না হয়েও তায়েফায়ে মানসূরা হওয়ার দাবী করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব কথা হল, যারা জিহাদের পথে নেই তারা তায়েফায়ে মানসূরা হওয়ার দাবী করা নিছক ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই না। তায়েফায়ে মানসূরা হতে হলে আগে মুজাহিদদের কাতারে শামিল হতে হবে। এখানে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর কথা খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,

(«ولن تزال... إلخ») واختلف في تعيين مصادقِهِ وكلٌّ ادّعى بما بدا له.

قلت: كيف مع أنه منصوصٌ في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فلا أدري من هي؟ ولم أكن أفهم مراده لأنك قد علمت أنها المجاهدون بنص الحديث. ولا يمكن عنه الغفلة لمثل أحمد رحمه الله فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي مراده: وهو أن المجاهدين ليسوا إلا من أهل السنة، فعلمت أنه عيَّنَهم من تلقاء جهادهم لا من جهة عقائِدِهم، ويشهد له التاريخ فإنه لم يُوفَّق للجهاد أحد غيرُ تلك الطائفة. وأكثر تخريب السلطنة الإسلامية كان على أيدي الروافض خذلهم الله ولعنهم.

'তায়েফায়ে মানসূরা হওয়ার দাবী সবাই করে থাকে। তবে এই দাবী অবান্তর। কারণ, হাদীসের মধ্যে তাদের পরিচয় মুজাহিদ হিসাবেই দেয়া হয়েছে। কেউ মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে কিভাবে তাদের দলকে তায়েফায়ে মানসূরা হওয়ার দাবী করতে পারে?

তবে পরে দেখলাম যে, ইমাম আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'তাঁরা - তায়েফায়ে মানসূরা- যদি আহলুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্ না হয় তাহলে তাঁরা আর কারা হতে পারে আমার জানা নেই।' আমি প্রথমে এ কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না। কারণ, যেখানে হাদীসের ভাষ্যই বলে দিচ্ছে যে, তাঁরা হল মুজাহিদগণ। সেখানে যদি পরিধি বিস্তৃত করে আহলুস্সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ বলা হয় তাহলে হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্যের দাবী রইল কোথায়? পরে বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হল যে, যারা মুজাহিদ তাঁরা তো আহলুস্সুন্নাহরই অন্তর্ভুক্ত। তখন বুঝতে পারলাম, তিনি উক্ত জামাতের পরিচয় দিয়েছেন অভিনব এক আঙ্গিকে। তিনি তাদের পরিচয় দিয়েছেন তাদের আমলের দিকটাকে সামনে রেখে। তাদের আকীদার বিষয়টি সামনে রেখে নয়। অর্থাৎ, যারা জিহাদ করছে তাঁরা আহলুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। আর তাঁরাই মুজাহিদীন। কারণ, ইতিহাস সাক্ষী আহলুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ব্যতীত জিহাদের মত সুমহান আমলের তৌফিক অন্য কোন দলের নসীব হয়নি। পক্ষান্তরে ইসলামী সাম্রাজ্য ধ্বংসের পিছনে রাফেজীদের ভূমিকাই বেশি ছিল। আল্লাহ তাদের লাঞ্চিত করুন!.



দারসুল ফিকহ

জিহাদের আদব ও বিধিবিধান সমূহ

-শহীদ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম রহ.

ইসলামী দাওয়াত প্রচার এবং মানবজাতিকে কুফুরের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে ঈমানের শিষ্টাচারের দিকে নিয়ে আসা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের অন্ধকার থেকে বের করে দুনিয়া ও আখেরাতের আলো পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্যই ইসলামে যুদ্ধকে (জিহাদ) বিধান হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

আর একারণেই ইসলামী দাওয়াতের সামনে যে সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক জটিলতা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই মূলত ইসলামে জিহাদকে বিধান হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টিকে আমরা এভাবে ব্যক্ত করতে পারি যে, দুনিয়াবাসীদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর সকল প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে চুরমার করার জন্যই জিহাদের আগমন হয়েছে। অতএব মানুষ যদি এই দীন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তাহলে তরবারি চালানো এবং রক্তপাত করার কোন প্রয়োজন নেই। মালামাল নষ্ট করা এবং ঘরবাড়ি ও স্থাপনা ধ্বংস করারও কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এই দীন তো এসেছে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনের জন্য, ফ্যাসাদ কিংবা অরাজকতা সৃষ্টির জন্য নয়।

মুসলিম উম্মাহর ওপর জিহাদ ফরজ। কারণ তারাই তাওহীদের পতাকাবাহী এবং তারাই তাওহীদের দাওয়াত পৃথিবীর সব জায়গায় পৌঁছানোর জন্য আদিষ্ট। সুতরাং যদি কোন রাজনৈতিক সংগঠন কিংবা বর্তমান শাসনব্যবস্থার কারণে তাওহীদের দাওয়াতের মধ্যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কারণ তারা মানুষের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে কোন রাজনৈতিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি, গোত্রিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি কিংবা আন্তর্জাতিক শক্তি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হবো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো যতক্ষণ না তারা এই দীনের সামনে মাথানত করে এবং আমাদের জন্য দীন পৌঁছানোর সকল রাস্তা খুলে দেয়। যাতে আমরা ঐ সকল লোকদের উদ্ধার করতে পারি যাদের উদ্ধার করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি।

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

অর্থ: **'আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেতনা (শিরক, কুফুর ইত্যাদি) নির্মূল হয় আর দ্বীন (ইবাদত) সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদি তারা (অন্যায় থেকে) বিরত হয় তাহলে তারা যা করে আল্লাহ তা অবশ্যই দেখতে পান।'** (সূরা আনফাল, আয়াত ৩৯)

সুতরাং ফিতনা নির্মূল করা এবং ঐ সকল বাতিল উদ্দেশ্যের দলগুলো ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই জিহাদ, যারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে মানুষের ইবাদত করতে বাধ্য করে। এখন তারা যদি আত্মসমর্পন করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে না রাখে তাহলে মানুষ হত্যা করা এবং ঘরবাড়ি ধ্বংস করার কোনই প্রয়োজন নেই। ইসলাম মানুষকে (এমনকি তাগুতদেরও) দুনিয়াতে জাহিলিয়্যাতের অন্ধকার এবং আখেরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করতে চায়। আর এ কারণেই রাসূল সা. আলী রাযি. এর নিকট খাইবার যুদ্ধের ঝাণ্ডা অর্পণ করার সময় বলেছিলেন,

فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْتَدِيَ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

অর্থ: **'আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি একজন লোকও হেদায়েত পায় তাহলে এটা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।'**

মানব প্রভূদের হাতে জিম্মি অসহায় সম্প্রদায়কে উদ্ধার করার জন্যই জিহাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সুতরাং অবশ্যই এই সকল প্রভূদেরকে বান্দার কাতারে এবং অসহায় ও দুর্বলদের স্বাভাবিকদের কাতারে এনে দাঁড় করাতে হবে। এসকল প্রভূরা যদি তাদের অবস্থান ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাহলে অবশ্যই তাদের অহংকার ভেঙ্গে দিতে হবে এবং তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

আর এজন্য ইসলামে জিহাদের নির্ধারিত কিছু মূলনীতি রয়েছে। সবসময় এই মূলনীতির ওপরে থেকে জিহাদ করতে হবে এবং মুজাহিদকে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তার জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হল ইসলামী দাওয়াত প্রচার করা।

জিহাদের মূলনীতি:

১। কোন সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করার পূর্বে অবশ্যই তাদের সামনে ইসলামী দাওয়াত পেশ করতে হবে। দাওয়াত পেশ করা ব্যতিত তাদের সাথে জিহাদ করা জায়েয নেই।

২। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ না নেয় তাদের হত্যা করা জায়েয নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾

অর্থ: 'আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা (শিরিক, কুফুর ইত্যাদি) নির্মূল হওয়া পর্যন্ত।

قاتلوا এটা উভয়দিকে অংশীদারিত্ব বাচক ক্রিয়া। অর্থাৎ মুসলমানরা শুধুমাত্র যোদ্ধাদের সাথেই যুদ্ধ করবে। যাদের কোন শক্তি বা দাপট নেই এবং যাদের পক্ষ থেকে ফিতনার আশংকা নেই যেমন, বৃদ্ধ, নারী, শিশু, পঙ্গু এবং মানুষের সমাজ থেকে আলাদা হয়ে দূরে একাকি বাস করে এমন মানুষদের হত্যা করা জায়েয নেই।

৩। আসবাবপত্র ধ্বংস করা, গাছপালা কাটা, ঘর-বাড়ি পোড়ানো জায়েয নেই। তবে দাওয়াতের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ জায়েয আছে।

৪। যুদ্ধের পরে অঙ্গচ্ছেদন এবং অঙ্গবিকৃতিকরণ জায়েয নেই।

৫। নতি স্বীকার করে আত্মসমর্পন করা এবং নিরাপত্তা চুক্তির পরও যুদ্ধ করা জায়েয নেই। এমনিভাবে প্রতিশ্রুতি পূরণ ও চুক্তি আদায় করার পরও তাদের সাথে প্রতারণা করা জায়েয নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

অর্থ: 'তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে এবং যারা তোমাদের সে চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি কিংবা তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের ব্যাপারটি আলাদা। মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদেও সাথে চুক্তি মেনে চলবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মোত্তাকীদের পছন্দ করেন।' (সূরা তাওবা, আয়াত ৪)

হাদীসে এসেছে,

عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة

অর্থ: 'হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক প্রতারকেরেই নির্দিষ্ট একটা চিহ্ন থাকবে।' (সহীহ বুখারী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৬৪) এখন আমরা এ সকল মূলনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। ইনশাল্লাহ।

দাওয়াত উপস্থাপন

যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম থেকে তিন রকম মতামত পাওয়া যায়।

১। যুদ্ধের পূর্বে শত্রুদের সতর্ক করা ওয়াজিব। ইতিপূর্বে তাদের কাছে দাওয়াত পৌছাক বা না পৌছাক। ইমাম মালেক রহ. এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

২। তাদের নিকট দাওয়াত পৌছানো ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। ইতিপূর্বে তাদের নিকট দাওয়াত পৌছাক বা না পৌছাক।

ইমাম মালেক রহ. তার মতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেন।তিনি বলেন,

ما قاتل رسول الله صلى الله عليه و سلم قوما قط إلا دعاهم

অর্থ: 'রাসূল সা. কখনই দাওয়াত দেওয়া ব্যতিত কোন কওমের সাথে যুদ্ধ করেননি।' (নাইলুল আওতার ২৩০/৭) হাত্তাব রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, দাওয়াত দেওয়া ব্যতিত কখনই মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। (মাওয়াহিবুল জালীল- ৩৫০/৩)

খারাজ (الخراج) নামক কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতামত বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, তিনিও ইমাম মালেক রহ. এর সাথে একমত । তিনি বলেন, 'আমাদের নিকট যত সংবাদ পৌছেছে তাতে দেখা যায় যে, রাসূল সা. কখনই কোন কওমকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা ব্যতিত তাদের সাথে যুদ্ধ করেন নি।' (আল খারাজ- ৭০২)

عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : (كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال اغزوا بسم اللّه في سبيل اللّه قاتلوا من كفر باللّه اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم

অর্থ: 'সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন কাউকে কোন অভিযান বা সৈন্যদলের আমীর বানাতেন তখন তাকে এই বলে ওসিয়াত করতেন যে, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে, তোমার সাথীদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রাখবে। অতঃপর তিনি বলতেন, যাও আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ কর। এবং যারা তাঁর সাথে কুফুরি করে তাদের হত্যা কর। তোমরা যুদ্ধ করবে; কিন্তু কারো ওপর জুলুম করবে না। প্রতারণা করবে না। অঙ্গবিকৃতি করবে না এবং নারী হত্যা করবে না। মুশরিকদের সাথে মোকাবেলার পূর্বে তোমরা তাদেরকে তিন জিনিসের দিকে ডাকবে। তারা যেটা বেছে নেয় তোমরা তাদের থেকে সেটাই গ্রহণ করবে।' (নাইলুল আওতার ৩৩২/৭)

এক. তোমরা তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না; বরং তাদেরকে হিজরতের প্রতি আহ্বান করে বলবে তোমরা যদি হিজরত কর তাহলে মুহাজিররা যা পায় তোমরাও তা পাবে। যদি তারা হিজরত করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বলবে, 'তোমরা যদি এখানে থাকো তাহলে আরবের মুসলমানদের মত তোমাদের ওপরও জুলুম নির্যাতন নেমে আসবে এবং তোমরা ফাই ও গনীমতের কোন অংশ পাবে না। তবে যদি তোমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ কর (তাহলে পাবে)।'

দুই. তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাদের জিযিয়া দিতে বলবে। যদি তারা জিযিয়া দেয় তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না।

তিন. তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে আল্লাহর নামে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

৩। অধিকাংশ ইমামদের মতে পূর্বে তাদের নিকট দাওয়াত না পৌছে থাকলে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব। আর পৌছে থাকলে ওয়াজিব নয়।

শাফেয়ী মাযহাব: নেহায়াতুল মুহতাজ نهاية المحتاج নামক কিতাবে রমালী রহ. বলেন, যদি আমরা একথা জানতে পারি যে, তাদের নিকট ইতিপূর্বে ইসলামী দাওয়াত পৌছেনি। তাহলে দাওয়াত পৌছা পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবো। দাওয়াত দেওয়া ব্যতিত যদি কেউ যুদ্ধ করে এবং অন্য কাউকে হত্যা করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং এজন্য তাকে মুক্তিপণ দিতে হবে। আর হ্যাঁ, ইতিপূর্বে যদি তাদের নিকট দাওয়াত পৌছে থাকে, তাহলে দাওয়াত দেওয়া ব্যতিতই তাদের সাথে কিতাল করা হবে। (নেহায়াতুল মুহতাজ ৪৬/৮)

হানাফী মাযহাব: সারাখসী রহ. বলেন, 'ইতিপূর্বে যদি তাদের নিকট দাওয়াত পৌছে থাকে তাহলে দাওয়াত পৌছানো না পৌছানো মুসলমানদের ইচ্ছাধীন। তারা চাইলে দাওয়াত পৌছাতে পারে আবার দাওয়াত পৌছানো ছাড়াই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে। কারণ তারা তো জানেই মুসলমানরা তাদের কাছে কী চায়। হ্যাঁ, এটাও সত্য কথা যে, পূর্বের সতর্কতা কখনো কখনো উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়; বরং পূর্বে দাওয়াহ পৌছে থাকলে, দাওয়াত দেওয়া ছাড়াই যুদ্ধ করা ভাল। (শরহুস সিয়ার, ৭৭/১)

দ্বিতীয় মাজহাব সমর্থনকারী আলেমগণ তাদের মতের স্বপক্ষে খুবই মজবুত এক দলীল পেশ করে থাকেন। তাহলো- আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, বুখারী ও মুসলিমে হাদীসটি উল্লেখ আছে। 'আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বলেন, আমি যুদ্ধের পূর্বে কাফেরদের ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে জানতে চেয়ে নাফে' রাযি. এর নিকট চিঠি পাঠালাম। তিনি আমাকে লিখে জানালেন, এটা ইসলামের শুরুতে ওয়াজিব ছিল। আর রাসূল সা. বনী মুস্তালিকের ওপর এমন সময় আক্রমণ করেছেন যখন তারা একেবারেই অসতর্ক ছিল এবং তাদের উটগুলো পানি পান করছিল। অতঃপর তিনি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করেছেন এবং তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বন্দী করেছেন। জুওয়াইরিয়া রাযি. এ যুদ্ধেই যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. আমার নিকট এমনই বর্ণনা করেছেন। এই যুদ্ধে তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

দুই মাযহাবের (প্রথম ও দ্বিতীয়) মাঝে মতানৈক্যের মূল কারণ হচ্ছে, দুটি হাদীসের মাঝে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। একটি এই হাদীস অপরটি নিম্নে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সা. কোন কওমকে দাওয়াত দেওয়া ব্যতিত তাদের সাথে যুদ্ধ করেননি। ইমাম মালেক রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। কারণ এটা কওলী (মৌখিক)। আর কওল ফেয়েলের (কাজের) ওপর প্রাধান্য পায়।

এবং দ্বিতীয় মাযহাব: (যারা দাওয়াত পৌছানোকে কোন অবস্থাতেই ওয়াজিব মনে করেন না।) নাফে রহ. হাদীসটি গ্রহণ করেছেন এবং তারা বলেন, গাজওয়ায়ে বানী মুস্তালিকে রাসূল সা. এর কার্যক্রমই ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসের জন্য নাসেখ (রহিত কারী)।

আর জমহুরগণ: (তৃতীয় মাযহাব গ্রহণকারী ওলামায়ে কেরাম) উভয় হাদীসের মাঝে যোগসূত্র কায়েম করাকে পছন্দ করেছেন এবং নাফে রহ. এর হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়,

إنما كان ذلك في أول الاسلام

'ইসলামের শুরুর দিকে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা হতো। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যদি ইসলামের দাওয়াত পৌছে না থাকে তাহলে দাওয়াত পৌছাতে হবে আর যদি পৌছে থাকে তাহলে প্রয়োজন নেই।'

দুই হাদিসের মাঝে সমন্বয় করে আমল করাই উত্তম। কেননা কোনটাকে নসখ করা অথবা একটাকে আরেকটার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার পূর্বে যদি একটাকে আরেকটার সাথে একত্র করে আমল করা যায় তাহলে তাই করতে হবে। এমনিভাবে ইবনে আব্বাস সা. এর হাদীস আম, অন্যদিকে নাফে রহ. এর হাদীস খাছ। আর খাছ আমের ওপর প্রাধান্য পায়।

এই হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, দাওয়াত সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এবং সব স্থানে পৌছে গেছে। কিন্তু যদি রোম, তুর্কিস্তানের পিছনে এমন কোন জাতি থাকে, যাদের নিকট দাওয়াত পৌছেনি তাহলে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয নেই। কারণ রাসূল সা. এমনটিই করতেন। কিন্তু আমার জানা নেই যে এখনো কোন জাতি কি এমন আছে যাদের নিকট দাওয়াত পৌছেনি। বরং সব জায়গাতেই দাওয়াত পৌছে গেছে।

জমহুরের মতটিই আকলী এবং নকলী উভয় দিক থেকে প্রাধান্যযোগ্য। বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. আনসারদের একটি দল আবূ রাফেকে হত্যা করতে পাঠালেন, অতপর আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাযি. তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করলেন। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাযি. আবূ রাফেকে (আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আল হাকীকাকে) সতর্ক করা ছাড়াই হত্যা করলেন।



মুমিনের জীবনে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার গুরুত্ব

শায়েখ খালেদ আল হুসাইনান রহ.

যে মুমিন আখেরতের সবচে' বড় সম্মানজনক মর্তবা লাভের কামনা করে, অবশ্যই তাকে মহান আল্লাহর সাহায্য ও তৌফিক পেতে সচেষ্ট হতে হয়। প্রতিদিন আমরা নামাযে এ আয়াত إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ পাঠ করি। তবে এর মর্ম ক'জন বুঝি? অনেকেই জানে না 'আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার অর্থ কী? এটা যে মুমিনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে, এটা ছাড়া যে ইহকালীন-পরকালীন কোন কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যা সম্পন্ন হয় তা যে তারই অনুগ্রহ ও সহজীকরণের ফলেই হয় - এসব বিষয় কি আমরা ভাবি?

একটু ভাবুন:

এ আয়াতটিতে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খ সা'দী রহ. বলেন, 'অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনারই এবাদত করি অন্য কারো নয়। আপনার কাছেই আমাদের সব আকুতি-মিনতি, অন্য কারো কাছে নয়।'

যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন, আমরা আপনার এবাদত করি অন্য কারো নয়; আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি অন্য কারো কাছে নয়।

যেসব কথা কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাই এবাদত। চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে। আর আয়াতে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ সাহায্য প্রার্থনা বলতে যাবতীয় কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূর করণে আল্লাহর উপর ভরসা করাকে বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহর এবাদতে নিমগ্নতা এবং তাঁর সাহায্য কামনাই চিরস্থায়ী সফলতার মাধ্যম এবং সমূহ অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। সুতরাং এ দু'টো ব্যতীত মুক্তির পথ রুদ্ধ।

এবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত: এবাদত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে যখন তা প্রিয় নবীর দিক নির্দেশনা মোতাবেক হবে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তা করা হবে। এ দুটির সমন্বয় সাধন হলেই তা এবাদতের স্বীকৃতি পাবে। আয়াতে এবাদতের পর إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তথা সাহায্য প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। অথচ, এবাদতের মধ্যেও সাহায্যের বিষয়টি রয়েছে। এর কারণ হল, বান্দা এবাদত পালনের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাহায্যের ভিখারী। তার সাহায্য ছাড়া বান্দা অচল।

হাফেজ ইবনে রজব রহ. বলেন, একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য এজন্য চাইতে হয় কেননা, তাঁর সাহায্য ছাড়া কল্যাণ লাভ করা কিংবা অকল্যাণ দূর করা বান্দার সাধ্যের বাইরে। ইহকালিন ও পরকালিন সকল কল্যাণ তাঁর অনুগ্রহেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং আল্লাহ যাকে সাহায্য করলেন সে সাহায্য প্রাপ্ত, আর যাকে লাঞ্চিত করলেন সে হতভাগ্য। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা-এর মর্মার্থ এটিই। কারণ, এর অর্থ হল আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষমতা বা যোগ্যতাই বান্দার নেই। এ (লা হাওলা......) বাক্যটির মাহাত্ম্য অনেক। এটিকে জান্নাতের একটি সুপ্ত ধনভাণ্ডার বলা যায়। বান্দা করণীয় কাজ বাস্তবায়ন করতে বর্জণীয় কাজ পরিত্যাগ করতে তার সাহায্যের ভিখারী। তাছাড়া পার্থিব সকল কাজে স্থিরতা, মৃত্যুকালিন ও তৎপরবর্তী বরযখ জগতের ভয়াবহতা এবং কেয়ামত দিবসের মহা দুর্যোগে দৃঢ়পদ থাকতে তাঁর সাহায্যের বিকল্প নেই। একমাত্র তিনিই এ মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে যে তাঁর সাহয্যের শর্তাবলী পূরণ করবে তিনি তাকে সাহায্য করবেন।

রাসূল স. বলেন, তোমার উপকারে আসবে এমন কাজের কামনা কর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। এ ক্ষেত্রে অপারগতা দেখিও না। -মুসলিম

আর যে আল্লাহর কাছে না চেয়ে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থণা করে আল্লাহ তাকে তার উপরই ছেড়ে দেন। ফলে সে লাঞ্চিত হয়।

হযরত হাসান রহ. খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর নিকট এ উপদেশ লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোকাছে সাহায্য চেও না। তাহলে তিনি তার উপরই তোমাকে ছেড়ে দিবেন।' পূর্ববর্তী কোন এক বুযুর্গ বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি অবাক হই তাদের দেখে যারা আপনার পরিচয় পেয়েও অন্যের দুয়ারে হাত বাড়ায়। অবাক হই কিভাবে তারা আপনার পরিচয় পেয়েও অন্যের কাছে সাহায্য চায়।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, ইবাদত পালনে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে মানুষ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত:

১- যারা আল্লাহর ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনায় সচেষ্ট। আল্লাহর ইবাদতই তাদের কামনা-বাসনা। তাঁর কাছে এর শক্তি ও তৌফিক প্রার্থনাই তাদের উদ্দেশ্য।

২- ইবাদত ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনায় যারা নিরস। যদি কখনও আল্লাহর সাহায্য কামনা করে তাহলে মনোবাঞ্ছা পূরণই তাদের উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা ও হক আদায়ের কোন ইচ্ছেই তাদের কল্পনায় থাকে না।

৩- যারা কিছুটা এবাদতগুজার বটে, তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার ধারে কাছে তারা যায় না। তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর সাহয্য প্রার্থনায় তারা বড়ই কৃপণ। ফলে তারা দুর্বলতা অক্ষমতা আর লাঞ্চনার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকে। ৪- কিছু মানুষ আছেন যারা এবাদতের ধারে কাছে যান না, তবে আল্লাহর সাহায্য কামনায় তৎপর থাকেন। কারণ, সে যখন এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, লাভ ক্ষতির দাতা একমাত্র আল্লাহই। আর উপকার অর্জন কিংবা অপকার প্রতিরোধ কোনটাই তার সাধ্যে নেই; তখন সে বাধ্য হয়েই নিজের কামনা চরিতার্থের আশায় আল্লাহর সাহায্য কামনার আশ্রয় নেয়। ফলে এজন্য সে কোন ভাল প্রতিদানেরও উপযুক্ত হয় না। সার কথা, এ চার শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকেরাই সফল। আল্লাহ তাআলা আমাদের যাবতীয় সকল কাজে তাঁর সাহায্য কামনার তৌফিক দান করুন। আমীন!

দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ বনাম জিহাদ

আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী রহ.

জিহাদ 'জাহদুন' ধাতুমূল থেকে নির্গত কর্তাবাচক শব্দ। যার অর্থ হল- জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা কিংবা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ না হয়ে বাহাদুরী ও পৌরুষ জাহিরের খায়েশ না করে; সর্বোপরি সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তারের নেশায় প্ররোচিত না হয়ে শুধু আর শুধু আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার নিমিত্তে পার্থিব সকল মোহ ত্যাগ করে নিজের জীবনকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় একেই জিহাদ বলে। আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা লক্ষ্য না হয়ে যদি পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জন লক্ষ হয়, অথবা সত্য মিথ্যার তোয়াক্কা না করে দেশ কিংবা জাতির স্বার্থ রক্ষাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট তা জিহাদ বলে গণ্য হয় না। যুদ্ধ-সংগ্রাম তখনই জিহাদ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে যখন তা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে। দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। মোট কথা, আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাগণ তাঁর দ্রোহী বান্দাদের সাথে দ্রোহী হওয়ার কারণে যুদ্ধ করা এবং আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় জীবনের সর্বোচ্চ বিসর্জন এবং উৎসর্গের নামই হল জিহাদ। তবে শর্ত হল, উক্ত বিসর্জন ও উৎসর্গ শুধু মাত্র এজন্যই হবে যে, আল্লাহর নাম বুলন্দ হবে এবং তাঁর বিধানাবলী অবমূল্যায়ন থেকে রক্ষা পাবে। এ ক্ষেত্রে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য না থাকা চাই। এমন উৎসর্গ ও বিসর্জনকে ইসলামে জিহাদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

যদি অর্থ বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থ-উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অথবা ইসলামী অনুপ্রেরণা ছাড়াই সাম্প্রদায়িকতা, দেশ কিংবা জাতীয়তা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে শরীয়তের ভাষায় তাকে জিহাদ বলবে না। **এ ব্যাপারে হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল স. কে জিজ্ঞেস করা হল, কেউ নিজের বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য জিহাদ করে, আবার কেউ নিজের জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য জিহাদ করে, আবার কেউ নাম ও প্রসিদ্ধির জন্য জিহাদ করে -এর কোনটি জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ? তখন হুযুর স. বললেন,**

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করে সেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে। "

ইমাম বোখারী রহ. বোখারী শরীফের মধ্যে একটি অধ্যায়ের শিরোণাম দিয়েছেন باب لا يقال فلان شهيد (কোন ব্যক্তিকে 'অবশ্যই সে শহীদ' না বলা) কারণ, কারো মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অন্তরের অবস্থা কেমন ছিল তা তো কারো জানা নেই। উক্ত অধ্যায়ে একটি ঘটনা উল্লেখ হয়েছে যে, কোন এক যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ বাঁধল। তখন কায্‌মান নামী এক ব্যক্তি ও মুসলমানদের সাথে ছিল। আসলে সে মুনাফিক ছিল। যুদ্ধে সে মুশরিকদের সাথে বীরদর্পে যুদ্ধ করল এবং তার কীর্তি দেখাল। তখন সাহল ইবনে সাদ সায়েদী রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ তো ততটুকু কাজ করতে পারলাম না যতটুকু সে করেছে! হুযুর স. বললেন, শুনে রাখ! সে জাহান্নামী। অবশেষে সে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মারাত্মক আহত হল। ব্যাথার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করল।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীসের সাথে অধ্যায়ের শিরোনামের যোগসূত্র হল, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেনি; বরং নিজ সম্প্রদয়ের জন্য জিহাদ করেছিল। এজন্য তাকে শহীদ বলা যাবে না।

এ থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নবীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল না; বরং দেশ ও সম্প্রদায়ের জন্য যুদ্ধ করল, এমন ব্যক্তিকেও শহীদ বলা হবে না। জাতি গোষ্ঠির জন্য ইসলামী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলার তো প্রশ্নই আসেনা।

হাফেজ বদরুদ্দিন আইনী রহ. বলেন, যুদ্ধের ময়দানে সর্ব প্রথম এই কায্‌মান নামী ব্যক্তিই অগ্রসর হয়েছিল। সর্বাগ্রে সে-ই কাফেরদের দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিল। আর চিৎকার দিয়ে নিজ সম্প্রদায়কে ডেকে ডেকে বলছিল, হে আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়! নিজেদের বংশীয় মর্যাদা এবং সম্মান রাক্ষার্থে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। যখন সাহাবী কাতাদা ইবনে নোমান রাযি. তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তার গুরুতর অবস্থা দেখে বললেন, তোমার জন্য শাহাদাত মোবারক হোক! তখন উক্ত আহত ব্যক্তি বলল, কসম খোদার! আমি ইসলামের জন্য যুদ্ধ করিনি। আমি তো আমার গোত্র ও জাতির জন্য যুদ্ধ করেছি।

স্পষ্টতই তার উদ্দেশ্য ছিল, গোত্র ও জাতির জন্য যুদ্ধ করা। আর এ জন্য জীবন দিলে কেউ শহীদ হতে পারে না। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা এবং জীবন বিলানোর দ্বারাই কেউ শহীদ হতে পারে। যে কোন যুদ্ধকে জিহাদ আর নিহতকে শহীদ বলার অধিকার কারো নেই।

উক্ত লোকটি পরে যখন আত্মহত্যা করল, তখন রাসূল স. বললেন ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر আল্লাহ তাআলা ফাসেক ব্যক্তিদের দিয়েও দ্বীনের কাজ নেন। এ বর্ণনাটি উমদাতুল কারী باب لا يقال فلان شهيد অধ্যায়ে উল্লেখ আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا

আর যেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। আলে ইমরান-১৬৬

সেদিন মুনাফিকদের বলা হয়েছিল, আসো! আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় কিতাল কর। আর যদি আল্লাহর জন্য জিহাদ করতে না পার, তাহলে অন্তত নিজ সম্প্রদায় ও পরিবার পরিজনের জন্য হলেও শত্রুদের মোকাবেলা কর। কারণ, শত্রুরা যদি প্রবল হয়ে যায়, তাহলে তারা তাদের প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম আর অমুসলিমের মাঝে কোন পার্থক্য করবে না; বরং সকলকেই গণহারে হত্যা করবে।

উল্লিখিত আয়াতটি মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে লড়েছিল। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও অন্য মুনাফিকরা লড়েছিল শুধুই নিজ জাতি ও গোত্রের জন্য। এ থেকেও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে যুদ্ধ কখনই জিহাদ নয়। আয়াতে ادْفَعُوا -তোমরা শত্রুর মোকাবালা কর- এটাকে যে قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -আল্লাহর রাস্তায় কিতাল কর- এর সমান্তরালে উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, (বদর যুদ্ধের সময়) কিছু মুসলমান -যারা মক্কায় অবস্থান করছিল আর কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল- তারা কাফেদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা সাহাবায়ে কোরামদের হাতে মারা পড়েছিল, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97)

যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। -নিসা ৯৭

এ আয়াত যাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল তারা এমনই ছিল যে, ইসলামের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও জাতি গোত্রের জন্য ইসলামের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। (আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন)

মোট কথা– ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাকে জিহাদ বলে। আর ইসলামী উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে দেশীয় কাফেরদের সাথে যুক্ত হয়ে আগ্রাসী শত্রুর মোকাবিলা করা, দেশ ও জাতির আযাদীর জন্য যুদ্ধ করা কোনভাবেই জিহাদ হতে পারে না। আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. স্বদেশীয় কাফেরদের সাথে মিলে কখনও যুদ্ধ করেননি। আর কাফেরদের সাথে মিলে কোন সমন্বিত রাষ্ট্রও গঠন করেননি; বরং নিজের সঙ্গীদের নিয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন এবং কাফেরদের থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন কোন স্থানে অবস্থান করেছেন। সেখানে জিহাদের প্রস্তুতি নিয়েছেন। আর সর্ব প্রথম নিজের সেই বিদ্রোহী জাতির সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং বিজয় করেছেন। প্রত্যেক রাসূলই সর্ব প্রথম নিজ গোত্রের সাথে জিহাদ করেছেন। তার পরে অন্য গোত্রের সাথে জিহাদ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক, আর জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। তাওবা -১২৩

রাসূল স. এর সব জিহাদই নিজের গোত্র, জাতি, আত্মীয়, বন্ধু-সজনদের সাথে করেছিলেন। কোন আগ্রাসী শত্রু বা কোন ভিনজাতির সাথে করেননি। বদর যুদ্ধের সময় তো মুহাজিরীনদের কারো সামনে পিতা ছিল, কারো সামনে ভাই ছিল, কারো সামনে চাচা, কারো সামনে মামা। আর না হয় আত্মীয় তো অবশ্যই ছিল। শুধু আল্লাহর জন্যই নিজেদের নির্মম তরবারীগুলো কোষমুক্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট!

ঈমান এমন এক অনুপ্রেরণার নাম যার সামনে লাইলি মজনুর সব কাহিনী ম্লান হতে বাধ্য। কোরআন হাদীসে যে হিজরতের ফযিলতের কথা এসেছে তার উদ্দেশ্য তো এটাই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য নিজের পিতামাতা জায়াকন্যা, সন্তান সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হলে ছেড়ে দিতে হবে। গোত্র-জাতি তো আরো অনেক পরের কথা। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যখন হিজরত করেন তাদের মধ্যে যাদের জীবনসঙ্গী, প্রিয় স্ত্রী ইসলামের চেয়ে কুফরীকে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং কুফরী অবস্থায় স্বজাতির মধ্যে থাকাকে পছন্দ

করে নিয়েছিল, তখন সেই সাহাবী জীবনসঙ্গীকে তালাক দিয়ে দিলেন। স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ-সম্পদ, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে মহানবীর ডাকে সাড়া দিয়ে মদিনায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

হে আমার ভাইগণ! হে আমার বন্ধুগণ! দেশ ও জাতীয়তাবাদ একটি ফিতনা। মুর্তি পূজার পরেই দেশ ও জাতীয়তাবাদের স্থান। তথাপি কুফুরান্তরে কুফর, শিরকান্তরে শিরক, জুলুমান্তরে জুলুম তো আছেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

মুমিনরা ভাই ভাই।

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। নিসা-১০১

তাই আল্লাহ তাআলার এই কালামকে সামনে রেখে মুসলমানদেরকে নিজেদের ভাই এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কাফেরদেরকে শত্রু মনে কর।

বিঃ দ্রঃ আল্লাহ তাআলা الْكَافِرِينَ বহুচনের খবর -বিধেয়- এক বচন ব্যবহার করে عَدُوًّا বলেছেন, বহুবচন اعداء ব্যবহার করেননি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ভূপৃষ্ঠে যত কাফের আছে তারা সবাই মুসলমানদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি তুল্য; তাদের মধ্যে সামান্যতম ভিন্নতা ও পার্থক্য নেই। আল্লাহ সত্যই বলেছেন। আমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

জাতীয়তাবাদীদের একটি সংশয়:

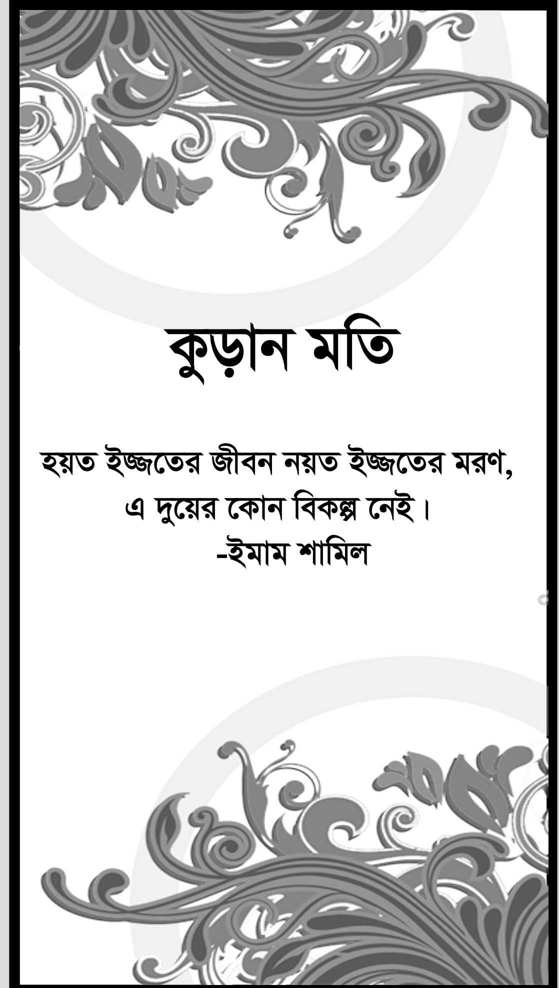
জাতীয়তাবাদীদের একটি দাবী হল, একরাষ্ট্রে অবস্থানকারী মানুষ সবাই এক গোত্রের লোকের মত। এটা তাদের একটি বড় সংশয় এবং ভুল ধারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাদের বিশেষ মতাদর্শ হচ্ছে, যারা তাদের আকিদা এবং মতবাদকে সমর্থন ও তার সাথে যোগ দিবে তারাই তাদের বন্ধু। চাই সে যে দেশের বা রাষ্ট্রেরই হোক না কেন।

আর যারাই তাদের সেই আকিদা ও মতবাদের বিরুদ্ধে তারাই তাদের শত্রু। যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা শিক্ষকই হোক না কেন। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যারাই এক মতবাদের সাথে সংযুক্ত হবে তারা যদিও পূর্ব পশ্চিমের দূরত্বে অবস্থান করুক; তবুও তারা কাছের ও একজাতি বলে পরিগণিত হয়। আর যারা ভিন্ন মতবাদের হবে তারা পস্পর ভাই ভাই হলেও তারা একে অপরের কাছে অন্তহীন দূরত্বে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। বুঝাই যাচ্ছে যে, একত্বের সূত্র দেশ ও রাষ্ট্র নয়; বরং মতবাদই হল একতার সূত্র। অতএব শরীয়তে যদি একতার সূত্র ইসলাম এবং কুফরকে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাকে পক্ষপাতিতা বা স্বজনপ্রীতি নামে কেন আখ্যায়িত করা হবে?

ইসলামের যাবতীয় বিধান ইসলাম এবং কুফরের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। মুসলমান এবং কাফের একে অপরের কাছ থেকে মিরাস পায় না। এরই সূত্র ধরে বেলাল হাবশী, সুহাইব রূমী, সালমান ফারসী ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আর আবু তালেবের মত আত্মোৎসর্গী চাচা ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে জানাযার নামায এবং মুসলমানদের কবরে সমাহিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হুযুর স. যখন আবু তালেবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ইচ্ছা করলেন তখন আল্লাহ তাআলা তা নিষেধ করতে এ আয়াত নাযিল করেছেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)

নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। তাওবা-১১৩



চারটি গরু নেকড়ে আর বিভক্তির গল্প

ইমাম আনোয়ার আল-আওলাকি রহ.

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের একটা গল্প বলবো। আপনারা অনেকেই হয়তো গল্পটা আগেও শুনেছেন। কিন্তু এই গল্পটা থেকে আমাদের জন্য অনেক কিছুই শেখার আছে।

গল্পটি চারটি গরুকে নিয়ে। তাদের মধ্যে একটি ছিল সাদা আর বাকি তিনটি ছিল কালো বর্ণের। তারা হিংস্র নেকড়ে পরিবেষ্টিত খুব বিপদজনক একটি জায়গায় থাকতো। কিন্তু তারা সবসময় একসাথে থাকতো, একে অপরের প্রতি খেয়াল রাখতো এবং চোখ কান খোলা রাখতো। ফলে শ্বাপদসংকুল এলাকায়ও তারা টিকে থাকতে পেরেছিল।

কিন্তু একদিন কালো গরু তিনটি গোপনে এক জায়গায় একত্রিত হলো। তারা বললো, সাদা গরুটা আমাদের জন্য বড্ড ঝামেলা সৃষ্টি করছে। আমরা কালো হওয়ায় রাতে আমাদের কেউ দেখতে পায় না, আমরা সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু ঐ সাদা গরুকে অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। ফলে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। তাই এক কাজ করা যাক, আমরা তিনজন একসাথে থাকি, আর ঐ ঝামেলাটাকে আলাদা করে দিই।

কথামত সেইদিন থেকে তারা তিনজন, বেচারা সাদা গরুটিকে আলাদা করে দিলো। এদিকে নেকড়ে ছিল খুব চালাক। সে গরুগুলোর ভিতর বিভেদ বুঝতে পেরে সাদা গরুটিকে আক্রমণ করলো। কালো গরু তিনটি কোন বাধাই দিলো না। তাদের ভাইকে যখন টুকরো টুকরো করা হচ্ছিলো, তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো।

কিন্তু নেকড়ে পরদিন রাতে তাদের তিনজনকে আক্রমণ করে বসলো। কারণ? নেকড়ে বুঝতে পেরেছিল, যেহেতু একটি গরু কম ছিল, তাই তারা এখন আগের তুলনায় দুর্বল। তাদের শক্তি অনেক কমে গেছে। ফলস্বরূপ নেকড়ে একটি কালো গরুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

পরদিন রাতে নেকড়ের কাজ আরো সহজ হয়ে গেল। কারণ এখন গরুর সংখ্যা আরো একটি কমে দুইটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু নেকড়ে আরো একটি গরুকে মেরে ফেলতে সক্ষম হলো। তার পরেরদিন মাত্র একটি গরুই বেঁচে ছিল। তাই নেকড়ে যখন তাকে আক্রমণ করতে আসলো, গরুটি বাধা দেয়ার পরিবর্তে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলো। নেকড়ে খুব ধীরে সুস্থে আগাচ্ছিল, কারণ সে জানে গরুটি একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাকে বাঁচানোর মত কেউ আর অবশিষ্ট নেই। সুতরাং তাড়াহুড়া না করে নেকড়ে যথাসময়ে গরুটির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। ঠিক তখনই, গরুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বললো, যে কথা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। গরুটি বলেছিল,

'আমি তো সেদিনই মারা গিয়েছি, যেদিন সাদা গরুটি মারা গিয়েছিল। আমি নিজের মৃত্যুকে সেদিনই ডেকে এনেছিলাম। আমি এখন মারা যাচ্ছি না। আমি আজ মারা যাচ্ছি না। আমি সেদিনই মারা গিয়েছি, যেদিন আমি সাদা গরুটিকে নেকড়ের হাতে একাকি ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নিশ্চয়ই আপনারা অনেকেই গল্পটির মূল বক্তব্য ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছেন। আমি এখানে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ।

প্রথম শিক্ষাঃ

উম্মাহ গল্পটি মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থার খুব ভালো একটি চিত্র উপস্থাপন করেছে। ঠিক এই ঘটনাই যেন ঘটে চলেছে বিশ্বজুড়ে। একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্রের পতন হচ্ছে, আর আমরা কিছু না করে বসে বসে শুধু দেখেই যাচ্ছি। যখন ফিলিস্তিন দখল করা হলো, আমরা কিছুই করলাম না। তারপর কাশ্মির, চেচনিয়া, ফিলিপাইন। উম্মাহ নিশ্চুপ। তালিকার সর্বশেষ সংযোজন ইরাক। ইরাকে যখন হত্যাযজ্ঞ চলছে, আমাদের দেখা তখনো শেষ হয়নি। আপনার কি মনে হয় এখানেই এর সমাপ্তি? কখনো নয়! এরপর হয়তো একদিন সিরিয়ায় সমস্যা দেখা দিবে। আল্লাহই ভালো জানেন তালিকায় এরপর কোন দেশ। এই রাষ্ট্রগুলো আজকে দখল হয়নি। আমরা যেদিন প্রথম রাষ্ট্রটি দখল করে নিতে দিয়েছিলাম, সেদিনই আমাদের প্রত্যেকের পতন আমরা ডেকে এনেছি।

দ্বিতীয় শিক্ষাঃ

ঐক্য অনৈক্যের ফল কী হতে পারে, গল্পটিতে তা ভালভাবেই ফুটে উঠেছে। যখনই ঐ গরুগুলোর মধ্যে বিভেদ দেখা দিলো এবং তারা একটি গরুকে নেকড়ের হাতে ছেড়ে দিলো, তখনই তারা হেরে গিয়েছিল। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহর একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। নুমান বিন বাশির রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার দিক দিয়ে মুমিনরা একটি দেহের মত। যখন দেহের কোন একটি অংশে ব্যথা অনুভূত হয়, অনিদ্রা আর জ্বরের কারণে পুরো দেহেই ব্যথা অনুভূত হয়'। (মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি, আপনার আঙ্গুল, পা কিংবা দেহের যে কোন অংশে যদি আঘাত লাগে; আপনি তখন ব্যথায় ঘুমাতে পারেন না! আপনাকে ইনফেকশন থেকে বাঁচাতে ক্ষতস্থানের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে আপনার শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুদ্ধ শুরু করে, ফলে আপনার জ্বর আসে। গোটা দেহই শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে শামিল হয়।

তাই যদি কোন মুসলিম আক্রান্ত হয়- পূর্বে হোক আর পশ্চিমে, উত্তরে কিংবা দক্ষিণে- দেহের কেন্দ্রেই হোক বা আঙ্গুলের ডগাতেই হোক, আপনার ঠিক তেমনই ব্যথা লাগা উচিত যেন নিজের পরিবারই আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু যদি আপনি শুধুমাত্র নিজের এবং নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, বুঝতে হবে আপনার কোন সমস্যা আছে। আপনি আসলে এই দেহের অংশই না! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, উম্মাহ একটি দেহের মত। যতক্ষণ তারা সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে পরিচিত; তারা কোন্ দেশের, কোন্ দলের, কোন মাযহাবের সেটি কোন বিবেচ্য বিষয় নয়।

কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এখন আমরা শুধু নিজের দলের মানুষদেরই মুসলিম মনে করি। অমুক আমার মতাদর্শ মেনে চলে না,সুতরাং ঐ ব্যক্তি আমাদের কেউ নয়- এটিই যেন আমাদের মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ আপনি কাউকে কাফির প্রমাণ করতে না পারবেন, সে একজন মুসলিম। যদি কেউ নিজেকে মুরতাদ দাবি না করছে, সে একজন মুসলিম- সে যে দেশের, যে দলের আর যে মাযহাবেরই হোক।

কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকার অর্থ এই নয় যে, আমরা সব দল কিংবা মাযহাবের মতপার্থক্য দূর করে একে অন্যের কপি হয়ে যাব। এটি একটি অবাস্তব ব্যাপার। ইসলামের জন্য করা কাজের পদ্ধতিতে আপনার সাথে অন্যের পার্থক্য থাকতেই পারে,আপনার সাথে আরেকজনের মাযহাবে হয়তো ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু আপনার ভাই যখন বিপদে পড়বে, আপনিই সবার আগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন- এটিই হলো ঐক্য। আপনি হয়তো এক ধরনের কাজ করেন, আরেকজন হয়তো অন্য ধরনের। এই পার্থক্যেরও দরকার আছে। আমরা আজ সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছি, তাই সব জায়গাতেই মুসলিমদের প্রবেশ করা প্রয়োজন। কেউ দাওয়াহর কাজে, কেউ ইলম অর্জনের কাজে আর কেউ ইবাদাহর প্রতি মনোনিবেশ করবে। সবার পক্ষে সব কাজ করা অসম্ভব।

একেক মানুষের দক্ষতার ক্ষেত্র একেক জায়গায়। কেউ ভালো আলিম হয়, কেউ ভালো ইমাম, কেউ ভালো শিক্ষক আবার কেউ হয়তো খুব ভালো উপদেষ্টা। প্রত্যেকটি মানুষই ভিন্নধর্মী। অনেকেই দেখবেন ঘাড় গুঁজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করছে, কথা বলার মত সময়ও তাদের নেই; কিন্তু তারাই মুসলিমদের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করছে। কারো কাজকেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তাই ঐক্যবদ্ধ থাকার অর্থ হলো- আপনার ভাইয়ের প্রয়োজনের সময় তার মতাদর্শ বিচার করতে না বসে, তার বিপদকে নিজের মনে করে ঝাপিয়ে পড়া। এটিই ঐক্যের সংজ্ঞা।

তাই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলিমদের দুঃখ কষ্ট আপনাকেও যেন স্পর্শ করে। আপনার জন্মভূমি না হলেও ফিলিস্তিন আর ইরাকে কী ঘটছে, তার খবর আপনাকে রাখতে হবে। কাশ্মীরে কী হচ্ছে, আপনার সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। অনেক মুসলিম দেশে নিজেদের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধ বিদ্যমান, হয়তো যুদ্ধও চলছে। তবুও একজন মুসলিম হিসেবে আপনি তাদের প্রতি বৈষম্য করতে পারেন না। সমস্যা কিংবা বিরোধের জন্য দায়ী রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারগুলো। কিন্তু ঐ দেশের মুসলিমরা তো কোন দোষ করেনি, তারা আমাদের ভাই- বিষয়টা এভাবেই দেখতে হবে। মুসলিম উম্মাহর জন্য আমাদের দরদ থাকতে হবে। মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে যার কোন চিন্তাই নেই, সে উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালবাসে’- বুখারি। তাই আপনি যদি মুসলিমদের ভালোবাসেন, হাশরের দিন আপনি তাদের সাথেই থাকবেন। আর আপনার ভালোবাসা যদি কাফেরদের জন্য হয়, আপনার হাশরও হবে তাদের সাথে। এটিই আল্লাহর বিচার। যারা মুসলিমদের ভালোবাসে, মুসলিমরা যেখানে যাবে তারাও সেখানেই যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমরা জানতে পারি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ মুশরেকদের বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদের উপাসনা করতে তাদের অনুসরণ করো। তাই যারা ক্রুশের উপাসনা করতো, তারা ক্রুশের পিছে পিছে যাবে। আর যারা মূর্তি পূজা করতো, তারা মূর্তির পিছে পিছে যাবে। আল্লাহ বলবেন, তোমরা তো দুনিয়াতে আমার ইবাদাত করোনি, তাহলে এখন আমার কাছে চাইতে এসেছ কেন?তোমরা যাদের উপাসনা করতে, তাদের কাছেই তোমাদের প্রতিদান খুঁজে নাও। তারপর আল্লাহ তাদের সেই সব নকল ঈশ্বর আর মূর্তিকে জাহান্নামের আগুনে ছুড়ে ফেলবেন আর তারাও অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। আল্লাহর চেয়ে অধিক ন্যায়বিচারক আর কে আছে?

তৃতীয় শিক্ষাঃ

বিশ্বাসঘাতকতার কুফল এবং মুসলিমদের পরিত্যাগ করার শাস্তি

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, তাই তার উচিত নয় ভাইয়ের উপর

অত্যাচার করা কিংবা কোন অত্যাচারীর হাতে তাকে তুলে দেয়া। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন; যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন; আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ত্রুটি গোপন রাখবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন'। বুখারি ও মুসলিম

গল্পের কালো গরুগুলো সাদা গরুটিকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা নিজেদের নিরাপত্তা চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল,সাদা গরটিকে আলাদা করে দিলেই তারা নিরাপদ হয়ে যাবে। ঐ সাদা গরুটাই যত সমস্যার মূল। ওটা একটা জঙ্গি। ওটাকে জেলে ঢুকিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু তারা যে বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারেনি সেটা হলো, তারাই নেকড়ের পরবর্তী টার্গেট হতে যাচ্ছে। সুতরাং প্রিয় ভাই, আপনি যদি নিজেকে বাঁচাতে চান- আমরা এখন বিপদ গ্রস্থ কোন মুসলিমের কথা বলছি না- আপনার নিজের নিরাপত্তার কথা বলছি। আপনি যদি নিজেকে বাঁচাতে চান, এই খেলা আপনাকে বন্ধ করতে হবে। একজন মুসলিমকেও যদি আপনি শত্রুর হাতে ছেড়ে দেন, আপনি আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারেন। 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন; যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন'। আপনি আজ আপনার মুসলিম ভাইকে যদি বিপদে সাহায্য করেন, কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

আমরা সবাই জানি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমরা একাকি কিছুই করতে পারবো না। যদি আপনি আল্লাহর সাহায্য পেতে চান, তাহলে আপনার ভাইয়ের সাহায্যে ঝাপিয়ে পড়ুন। আপনি কোন ভাইকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েই ভেবে বসবেন না যে তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কখনোই নয়। শয়তান কখনোই সন্তুষ্ট হবে না। গোটা উম্মাহকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না। আপনি অন্য কোন কিছুর বিনিময়েই তাকে খুশি করতে পারবেন না। আদম আঃ এর সৃষ্টিলগ্ন থেকে তার সাথে আমাদের যে শত্রুতার সূচনা হয়েছিল, কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। আপনি আপনার এক ভাইকে বলি দিলেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে না। তার পেট কখনোই ভরবে না। তার তৃষ্ণা কিছুতেই মিটবে না।

আজ যদি বিপদগ্রস্থ কোন মুসলিমকে আপনি পরিত্যাগ করেন, নিশ্চিত থাকুন কাল আল্লাহ আপনাকে পরিত্যাগ করবেন।

আর পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসকারী ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সন্তান সম্পূর্ণ অনৈসলামিক একটি পরিবেশে বেড়েউঠছে। আজ হয়তো আপনি তাদের আগলে আছেন, কিন্তু আপনি তো চিরদিন বেঁচে থাকবেন না। কাল যখন আপনি মারা যাবেন, তাদের কী হবে তা কি ভেবে দেখেছেন? আল্লাহই ভালো জানেন, হয়তো তারা অমুসলিম হয়ে যাবে! এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের সন্তানদের সঠিক পথে অটল রাখেন। কিন্তু প্রিয় ভাই, আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য, তাকে সঠিক পথে রাখার জন্য আপনার অবশ্যই আল্লাহর পথে কিছু বিনিয়োগ করে যাওয়া উচিত। কিয়ামতের দিন আপনার পরিবারের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর কাছে অভিযুক্ত হতে চাইবেন না? যেহেতু আপনিই তাদের এই অমুসলিম দেশে নিয়ে এসেছেন, আপনাকেই তাদের গুনাহের ভার বহন করতে হবে। জেনারেশনের পর জেনারেশন আসবে আর তাদের সবার দোষ আপনার ঘাড়েই চাপবে। তাই আপনার সন্তানের জন্য এখনই কিছু বিনিয়োগ করুন। আপনার বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। আল্লাহ আপনার পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং আপনার মৃত্যুর পর আপনার সন্তানদের পাশে থাকবেন।

ইবন আব্বাস রাযি. এর হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তুমি আল্লাহর প্রতি (আদেশ পালনের ব্যাপারে) যত্নবান হও, আল্লাহ তোমার প্রতি যত্নবান হবেন। কিন্তু কিভাবে? ইবনে রজব হাম্বলি রহ. তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে-

১) যদি আপনি আল্লাহর প্রতি যত্নবান হন, আল্লাহ খারাপ চিন্তা এবং ঈমানি দুর্বলতা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখার মাধ্যমে আপনার প্রতি যত্নবান হবেন।

২) যদি আপনি আপনার যৌবনে আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে যত্নবান হন, আল্লাহ বৃদ্ধাবস্থায় আপনার প্রতি যত্নবান হবেন।

৩) যদি আপনি আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে যত্নবান হন, আল্লাহ আপনার সন্তানদের প্রতি যত্নবান হবেন।
তৃতীয় ব্যাখ্যাটির ব্যাপারে ইবনে রজব রহ. মুসা এবং খিযিরের ঘটনার উদাহরণ দেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করছেন, 'আবার তারা চলতে শুরু করলো। (কিছুদূর এগিয়ে) তারা জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছলো। তারা অধিবাসীদের কাছে কিছু খাবার চাইলো; কিন্তু অধিবাসীরা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করলো, অতঃপর তারা একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীর দেখতে পেল। সে (খিযির) প্রাচীরটি সোজা করে দিলো, সে (মুসা আঃ) বললেন, আপনি চাইলে তো এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন!' ভাবার্থ- ১৮:৭৭

পরবর্তীতে খিযির আঃ তার এই কাজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন- 'প্রাচীরটি ছিল শহরের দুটি এতিম বালকের, এর নিচেই ছিল তাদের জন্য রক্ষিত ধনভাণ্ডার, তাদের পিতা ছিল একজন

নেককার ব্যক্তি, (এ কারণেই) তোমার মালিক চাইলেন ওরা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তাদের সম্পদ বের করে আনুক, এ ছিল তোমার মালিকের অনুগ্রহ, এর কোনটাই আমি নিজে থেকে করিনি আর এটিই হচ্ছে সেসব কাজের ব্যাখ্যা, যে ব্যাপারে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলে না।' ভাবার্থ- ১৮:৮২

দেখলেন তো, আল্লাহ কিভাবে তাদের পিতার সৎ কর্মের কারণে ছেলে দুটির সম্পদ রক্ষা করলেন। ছেলে দুটি বড় হয়ে ভালো হবে নাকি খারাপ হবে তা এখানে বিবেচ্য ছিল না, শুধুমাত্র তাদের পিতার সৎ কর্মের কারণেই আল্লাহ স্বয়ং খিযিরকে পাঠিয়ে তাদের রক্ষা করলেন! আল্লাহ আপনার এবং আপনার সন্তানদের প্রতি যত্নবান হবেন, এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে? তাই আমাদের উচিত আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। আপনার দায়িত্ব আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ আপনিই হবেন পরবর্তী টার্গেট।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি এতক্ষণ যা বললাম, তার জন্য আপনাকে ইরাক কিংবা ফিলিস্তিন যেতে হবে না। আপনার শহরে, আপনার প্রতিবেশীদের দিকেই একটু খেয়াল করে দেখুন। আপনি জানেন? আপনার নিজের দেশেই কত মুসলিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে? আপনি যখন গুয়ান্তানামো বে নিয়ে আহাজারি করেন, মনে রাখবেন আপনার নিজের দেশেই গুয়ান্তানামো বে আছে। শত শত মুসলিম বিনা অপরাধে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, জেলগুলোতে পঁচে মরছে, আপনি কী করেছেন তাদের জন্য? আপনার উত্তর আফ্রিকার ভাইয়েরা রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ এগিয়ে আসছে না তাদের সাহায্য করতে। কোথায় মুসলিম কমিউনিটি ? আপনি কী করেছেন তাদের জন্য? (সম্ভবত খুতবাটি আমেরিকায় দেয়া, তাই আফ্রিকানদের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের আত্মতৃপ্তিতে ভোগার কোন কারণ নেই। মনে আছে? আমরা রোহিঙ্গাদের সাথে কী করেছি?)

এক ভাই আমাকে তার পরিবারের অবস্থার কথা বলেছিলেন। এসব অসহায় ভাইবোনদের দেখাশুনা করার মতও কেউ নেই। পরিবারগুলো না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সাহায্যে কেউই এগিয়ে আসছে না। কিছুদিন আগে কয়েকজন ব্রিটিশ ভাইদের গ্রেফতার করা হয়। কোন অভিযোগ না পেয়ে পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। তাদের একজনকে গ্রেফতারের সময় সে কোন প্রতিরোধ না করে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু পুলিশ বিনা কারণে তাকে মারধোর শুরু করে। মার খেতে খেতে যখন তার শরীরের বিভিন্ন স্থান ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করে, তার চোখে কালশিটে দাগ পড়ে যায় এবং প্রস্রাবের সাথে রক্ত বেরুতে থাকে, পুলিশ তাকে সিজদারত অবস্থায় বসিয়ে দিয়ে ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করে, 'তোমার আল্লাহ এখন কোথায় গেল?'

ইসলামের, ধর্মের, উম্মাহর এত অপমানের পরও আপনি শুধু দেখেই যাবেন? এই অপমান শুধু ঐ ভাইকে করা হয়নি, এই অপমান করা হয়েছে ইসলামকে। কাউকে সিজদায় ফেলে, আল্লাহ কোথায় প্রশ্ন করা? আল্লাহু আকবার! তারা আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করছে? আল্লাহ ন্যায়বিচারক, তিনি এর যথাযোগ্য শাস্তিই দিবেন। আল্লাহ কোনভাবেই আমাদের মুখাপেক্ষী নন। আমাদের সাহায্যের কোন দরকার নেই তাঁর। কিন্তু আমরা কী জবাব দিবো?

আপনি শুধু বসে বসে দেখেই যাচ্ছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন, শুধু শুধু ঝামেলায় জড়িয়ে কী লাভ! তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই নিরাপদ। কিন্তু আপনি যদি আজ কোন প্রতিবাদ না করেন, কাল আপনার সাথে, আপনার স্ত্রীর সাথে, আপনার নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে একই ঘটনায় ঘটবে। এই ঘোড়া লাগাম ছাড়া হওয়ার আগেই একে থামাতে হবে। যেভাবেই হোক। আপনার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে হলেও আপনাকে এগিয়ে আসতেই হবে। মুসলিম ভাই, উম্মাহ এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি আপনার দায়িত্ব আপনাকে পালন করতেই হবে। উম্মাহর সমস্যা থেকে দূরে বসে শুধুমাত্র তত্ত্বকথা কপচানো কখনোই ইসলামের বৈশিষ্ট নয়। শুধুমাত্র এই কারণেই স্পেনের মুসলিমরা স্পেনের দখল হারিয়েছিল। ঐতিহাসিক আল-মাকারি লিখেছিলেন, ক্রুসেডাররা একের পর এক শহর আক্রমণ করছিলো আর দখল করে নিচ্ছিলো, কিন্তু আন্দালুসের মাসজিদগুলোতে এই বিষয়ে কোন আলোচনাই করা হতো না। মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে খুতবাগুলোতে কিছুই বলা হতো না, কিছুই না। উলামাগণ তখনও বিভিন্ন বৈষয়িক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তারা উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

আন্দালুসের প্রখ্যাত আলেম ইবনে হাজম আল-আন্দালুসি আন্দালুসের উলামা এবং ইমামদের এই নিশ্চুপ ভূমিকায় হতাশ হয়ে বলেছিলেন, 'এইসব ফাসিকদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না, যারা নেকড়ের অন্তরের উপর ভেড়ার পোশাক পরিয়ে নিজেদের আলেম দাবি করছে'। তিনি আরো বলেছিলেন, 'তারা করছে টা কি? তারা উম্মাহর কোন উপকারেই আসছে না। উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে! আন্দালুসের উপর শত্রুরা আক্রমণ করে দখল করে নিতে চলেছে, আর তারা এখনও ফিকহি বিষয় নিয়ে তর্ক করে চলেছে।'

তাই আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, আমাদের জড়তা কাটিয়ে সোজা হতে হবে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের কণ্ঠস্বর জোরাল করতে হবে। এটিও ইবাদাত। আপনি আপনার ভাইকে সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাতই করছেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে দুনিয়ায় সাহায্য করবেন এবং আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন। উম্মাহ এখন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সবার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের নিজেদের,আমাদের পরিবারগুলোকে এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের রক্ষা করেন। আমিন।



গণতান্ত্রিক সন্ত্রাসবাদঃ বিপন্ন পৃথিবী বিপন্ন দেশ

আহমেদ রফিক -

আমাদের অঞ্চলে একটি কথা বেশ প্রচলিত রয়েছে। কথাটি হলো, “মোগো মনু আর ঐ বাড়ির হারামজাদাটা মিল্লা পানিডুরে এককালে দৈ দৈ বানাইয়া হালাইছে”। অপরাধ এক –পানি ঘোলা করা– হওয়া সত্ত্বেও নিজের সন্তান হলো মনু বা সোনামনি আর পাশের বাড়ির ছেলেটা হলো হারামজাদা। প্রবাদটি গ্রামীন মানুষদের জীবন থেকে নেয়া হলেও আজ এই একচোখা দাজ্জালীয় নীতি বাসা বেঁধেছে সমাজের উঁচু থেকে উঁচু, শিক্ষিত থেকে উচ্চ শিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যে।

আমার ভাবতেই অবাক লাগে যে, যে ব্যক্তি এই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সম্মান পোষণ করে, সেই একই ব্যক্তি আফগানিস্তানের মুক্তিযোদ্ধা তালিবানদেরকে কিভাবে সন্ত্রাসী বলে! মনুষ্যজাতীয় প্রাণী হিসেবে ন্যুনতম বিবেচনাবোধটুকুও কি এদের অবশিষ্ট নেই? ইতিহাস বিজয়ীদের হাতে রচিত হয়। তাই পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহনকারীদের আজ বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা। আল্লাহ বাচিয়েছেন! যদি বিজয়ীরা হেরে যেতো, তাহলে এদেরকে কী হিসেবে অভিহিত করা হতো? হয়তো এদেশের পাঠ্যপুস্তকেই আজ পাকিস্তানীরা লিখতো যে, “১৯৭১ সালে একদল বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীরা আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তানকে দিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র করেছিলো। দেশপ্রেমিক জনতা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে তাদের রুখে দিয়েছে”। এমনটি হলে হতেও পারতো। কারণ এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি দেশকে যে বিভক্ত করা হয়েছিলো এটাকে তো অস্বিকার করার কোনো সুযোগ নেই; হোক সেটা যে কারণেই। কিন্তু তালিবানদের ক্ষেত্রে কখনোই এমনটি ঘটার সুযোগ নেই। তারা সর্বাবস্থায়ই মুক্তিযোদ্ধা; ন্যায়ের পক্ষের যোদ্ধা। তারা হারলেও যা জিতলেও তাই। কেননা তাদের দেশ কখনো আমেরিকার অংশ ছিলো না। আমেরিকানরা সেখানে নির্ভেজাল হানাদার ও আগ্রাসী। নৈতিক কিংবা যৌক্তিক কোনো দৃষ্টিতেই আমেরিকানদের অধিকার নেই আফগানিস্তানে থাকার। তাহলে কোন যুক্তিতে আপনি তালিবানদেরকে সন্ত্রাসী বলতে পারেন?

মিডিয়াতে ইসলামপন্থী প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে সন্ত্রাসী জঙ্গী হিসেবে সারাক্ষণ অপপ্রচার চালানো হলেও বাস্তবে গণতন্ত্রপন্থি সন্ত্রাসীদের হাতেই হতাহত হয়েছে লক্ষগুণ বেশী মানুষ। কিন্তু এদের কাছে ইসলামি জঙ্গীদের ছোড়া বোমা নির্মম হলেও প্লেন থেকে ছোড়া ‘গুচ্ছ বোমা’ কতোই না নান্দনিক! কি সুন্দর আদুরে নাম, আহা!!! মিডিয়ার অপপ্রচারে মানুষের মন মগজে এমন এক ধারণা গেথে দেওয়া হয়েছে; যেন Throwing a bomb is bad but dropping a bomb is good. শুধু বিগত দুই দশকে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে ইরাক আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইয়েমেনসহ বিভিন্ন দেশে পশ্চিমাদের আক্রমনে যে পরিমান মানুষ হতাহত হয়েছেন, মুসলমান জিহাদীদের হাতে গোটা মানব ইতিহাসেও এতো মানুষ হতাহত হয়েছে বলে মনে হয় না। তারপরও পশ্চিমারা হলো মানবতার বন্ধু আর মুসলিমরা হলো সন্ত্রাসী! সত্যিই কি বিচিত্র!

বৈশ্বিক এই বাস্তবতা থেকে আমাদের ক্ষুদ্র এই দেশটিও ব্যতিক্রম নয়। হত্যা-গুম-খুন-জালাও-পোড়াও যেন গণতন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্ধ অংশ। গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর মধ্যকার রাজনৈতিক সহিংসতা, গণতন্ত্র হত্যার জন্য সরকারী দলের হাতে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের হত্যা গুম; গণতন্ত্র বাচানোর নামে বিরোধী দলের অবিরাম জালাও পোড়াও; কিংবা হাড্ডির ভাগাভাগি নিয়ে একই দলের কুকুরদের কামড়া-কামড়িতেই এসব সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে প্রধানত। গণতন্ত্রবাদী সন্ত্রাসীদের এসব নৈরাজ্যে হতাহত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ; বিধবা হয়েছে শত শত নারী, এতিম হয়েছে শত শত অবুঝ সন্তান, বাবা-মায়েরা হারিয়েছে তাদের প্রাণপ্রীয় কতো সন্তান। এদের হাতেই পঙ্গু হয়েছে দেশের অর্থনীতি; পুড়েছে কতো মানুষের একমাত্র সম্বল গাড়িখানা, অনেক কষ্টেসৃষ্টে দেওয়া ছোট্ট মুদি কিংবা টং দোকানটি। দেশের ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি ডলারের। সহায় সম্বল হারিয়ে পথে বসেছে হাজার হাজার মানুষ। আজীবন পঙ্গুত্ব বরণ করেছে

অসংখ্য অসহায় মানুষ। বেশি কাটতির লোভ থেকে এক দিন হয়তো পত্রিকায় হেডলাইন বানিয়ে দায় সেরেছে হাই এফিশিয়েন্ট দালাল সম্পাদকেরা। এর পর আর কেউ খোজ রাখেনি তাদের।

গণতন্ত্রবাদী সন্ত্রাসবাদের এ কালো থাবা এদেশ জন্মের আগে ভারত ও পাকিস্তান আমলে যেমন ছিলো; তেমনি ছিলো স্বাধীনতার পরেও; প্রতিটি আমলেই। তারপরও অনেকেই এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের স্বপ্নের গণতন্ত্রের যাত্রার সূচনা ধরেন ১৯৯১ সাল থেকে। তাই আমরা দেখবো ৯১ সাল থেকে এই পর্যন্ত এদেশে কী পরিমান মানুষ হতাহত হয়েছে গণতন্ত্রবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে আর কী পরিমান মানুষ হতাহত হয়েছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে।

মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের হিসাবে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। অধিকার বলছে, শুধু ২০০১ সাল থেকে ২০১৩-এর আগস্ট পর্যন্ত সময়েই রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন তিন হাজার ৯২৬ জন এবং আহত হয়েছেন এক লাখ ৫৮ হাজার ২১১ জন। এর মধ্যে ২০০১ সালেই মারা গেছেন ৬৫৬ জন।

জাতীয় 'মানবাধিকার' কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, "এই সংখ্যা তো ভয়াবহ। যে মানুষগুলো মারা গেলেন কিংবা যে লক্ষাধিক মানুষ আহত হলেন, কে তাঁদের দায়িত্ব নিয়েছে? এটা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। কোনো সভ্য সমাজে এটা চলতে পারে না"।

এই ভদ্দর লোকের কথার সাথে আমিও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত। কোনো সভ্য সমাজে এটা চলতে পারে না। তাহলে যে সমাজে এটা চলছে সেটা নিশ্চয়ই অসভ্য বর্বর সমাজ? এবং যুগপৎ গণতান্ত্রিক সমাজ। গণতন্ত্রবাদী এই সন্ত্রাসীদের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। আজই, এক্ষুনি।

এবার আমরা দেখবো ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে কী পরিমান হতাহত হয়েছে।

ইসলামের নামে যেসব দল গণতন্ত্রের ফেরি করে বেড়ায় তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড যুক্ত হবে গণতান্ত্রিক সন্ত্রাসবাদের সাথে। কেননা তারা আইনী ও যৌক্তিক দিক থেকে তাদেরই দলভুক্ত।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার তথ্য মতে ১৯৯৮ সালে শায়খ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের নামে জেএমবি সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল রাজশাহীর বাগমারায় এই সংগঠনের দ্বিতীয় প্রধান নেতা সিদ্দিকুর রহমান

ওরফে বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে সর্বহারা দমন অভিযানের নামে পাঁচ জনকে হত্যা করা হয়; আহত হয় প্রায় আরো অর্ধশত লোক। এরপর ২০০৫ এর ১২ জানুয়ারি শেরপুর ও জামালপুরে ভিন্ন দুটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা চালায়। এতে আহত হয় ৩৫ জন। ১৫ জানুয়ারিতে বগুরা ও নাটোরে দুটি যাত্রা মঞ্চে বোমা হামলা করে। এতে নিহত হয় দু'জন, আহত হয় ৭০ জন।

এরপর ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট দেশব্যাপি তাদের পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় দু'জন, আহত হয় পঞ্চাশ জনের মতো। একই বছর ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠিতে তারা দুজন বিচারককে হত্যা করে। পরে একজন আইনজীবীকেও হত্যা করে। এরপর ২৯ নভেম্বর গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ভবনে তাদের বোমা হামলায় মারা যা ১০ জন। আহত হন আরো ত্রিশ জন।

অন্য দিকে ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ রাতে যশোর টাউন হল ময়দানে উদীচীর দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনের শেষে দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ২ টি বোমা বিস্ফোরণ হয়। এতে ১০ জন নিহত এবং আহত হয় প্রায় ২০০ জন।

২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ১২ জন নিহত হয় এবং আহত হয় প্রায় ত্রিশজন। এ হামলার জন্য দায়ী করা হয় হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ হুজিবিকে।

২০০৪ সালের ২১ মে সিলেটে বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর গ্রেনেড হামলা করা হয়। এতে তিনজন নিহত ও প্রায় সত্তর জন আহত হন। এ হামলার ব্যাপারে দায়ি করা হয় ইসলামী জঙ্গীদের, যদিও এ মামলার রায় এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট ঢাকায় আওয়ামী লীগের এক জনসভায় গ্রেনেড হামলা, যে হামলায় ২৪ জন নিহত হয় এবং তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সহ প্রায় ৩০০ লোক আহত হয়। এই হামলাটিতে ইসলামী জঙ্গিদেরকে ব্যবহার করা হলেও এটিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি রাজনৈতিক সহিংসতা। কারণ এখানে আওয়ামীলীগকে দুর্বল করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিপক্ষের হাত থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

২০০৫ সালের আটই ডিসেম্বর ময়মনসিংহের নেত্রকোনায় উদীচী কার্যালয়ে জেএমবির আত্মঘাতি বোমা হামলায় মারা যান আটজন। এই ঘটনায় আহত হয় পঞ্চাশ জনেরও বেশি।

ময়মনসিংহে ছিনেমা হলে বোমা হামলার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। যতোদূর মনে পড়ে সেখানে কেউ নিহত হয়নি। আনুমানিক ধরে নিচ্ছি পঞ্চাশ জন আহত।

এই হলো মোটামুটি এদেশে ইসলামী জঙ্গীদের তৎপরতা। এসব সংখ্যা যোগ করলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯। আমি যদি কোনো তথ্য সংযুক্ত করতে ভুল করে থাকি তার আনুমানিক সংখ্যা হিসেবে যদি আরো ২১ জন যোগ করি তাহলে সর্বসাকুল্যে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় একশত; আর আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩৫। আমি যদি আহতের সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করি তবুও তা দু' হাজার ছাড়ায় না।

পক্ষান্তরে মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হতাহতের যে সংখ্যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তা অনুযায়ী, শুধু ২০০১ সাল থেকে ২০১৩-এর আগস্ট পর্যন্ত সময়েই রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন তিন হাজার ৯২৬ জন এবং আহত হয়েছেন এক লাখ ৫৮ হাজার ২১১ জন। এর মধ্যে ২০০১ সালেই মারা গেছেন ৬৫৬ জন। পূর্বের ১০ বছরের কথা না হয় বাদই দিলাম।

আমরা কোনো অবস্থাতেই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পক্ষে নই। তা যে ব্যক্তিই করুক, যে দলই করুক। কথাটাকে যদি রিভার্স করি তাহলে বলবো, আমরা সকল অন্যায় হত্যাকাণ্ডেরই বিরুদ্ধে। যারাই অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করবে অবশ্যই তাদের বিচার হওয়া উচিত। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার কারণে দল ব্যান করা হলে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল দলকেই ব্যান করা উচিত। দলীয় নেতা-কর্মীদের দ্বারা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে যদি দলের নেতৃস্থানীয়দের হুকুমের আসামী হিসেবে ফাসি হয়, তাহলে সে বিধান সব দলের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিৎ। কেন পক্ষপাত করা হচ্ছে? শুধু ইসলামী জঙ্গীদের হত্যাকাণ্ডটাই কি নির্মম? যখন তখন গাড়ির মধ্যে পুড়িয়ে মারা, পেট্রোল বোমা ছুড়ে ঝলসে মারা, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মারা কি শৈল্পিক হত্যাকাণ্ড?

২৩/০২/২০১৫ তারিখে প্রথম আলোতে গোল টেবিল আলোচনার নিউজ দেখলাম। বিষয় "জঙ্গিবাদের হুমকিঃ বাংলাদেশ ভাবনা"। হ্যা, আমিও বলতে চাই। জঙ্গিবাদ পৃথিবীর জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। এটাকে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু সেটা কোন জঙ্গিবাদ? ইসলামী জঙ্গিবাদ, না কি গনতান্ত্রিক জঙ্গিবাদ???

এ প্রশ্ন আপনার বিবেকের কাছে রাখলাম। উল্লিখিত পরিসংখ্যান তার জবাব দেবে। আর আপনি কেবল তখনই এই অমোঘ সত্যটিকে গ্রহণ করতে পারবেন যখন আপনি একচোখা কানা দাজ্জাল হবেন না; হবেন না আত্মবিক্রেতা নীচু শ্রেণীর দালাল। হবেন সত্যিকার মানুষ; মনে প্রাণে ও বাস্তবে।





ইবনে কাসিমের আগমন ঘটেছে যাবে কি তুমি কাফেলাতে ?

মুহম্মাদ ইবনে কাসিম রহ., একজন অনন্য সাধারণ মুসলিম সেনাপতি। মাত্র সতের বৎসর বয়সে তিনি সিন্দুসহ আশপাশের বিশাল এলাকা ইসলামী খেলাফতের সীমানার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এতদাঞ্চলে ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন করেন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেরশ বৎসর পূর্বে গত হয়ে গেছেন ইসলামের এই মহান সেনাপতি। কিন্তু তার কীর্তি, তার অবদানের কথা আজও মুছে যায়নি ইতিহাসের পাতা থেকে। আজ ও আমরা তাকে স্মরণ করি পরম শ্রদ্বা ভরে এবং তামান্না করি নতুন একজন মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের পুণঃআগমনের। কিন্তু কর্ম-বিমূখ আমাদের এই তামান্নার দশা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আরেকজন মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের প্রয়োজন বলে আমরা আসলে কি বুঝাতে চাই? আমরা নিজেরাই বা এ কথার মর্ম কী বুঝে থাকি? আমাদের সার্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় আমরা একথার র্মম এ বুঝে নিয়েছি যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর সপ্তদশবর্ষী মহান সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমের (হুবহু) পুনরায় আগমন ঘটবে আর আমরা তাঁর নেতৃত্বের হাল ধরে পৃথিবীতে পুনরায় ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবো, নির্যাতিতা মা বোনদেরকে উদ্ধার করবো। আমরা একটি বারও চিন্তা করে দেখিনি যে, এটি কখনো হবার নয় এবং এটি আল্লাহ তায়ালার নেযামও নয়। বরং আল্লাহ তায়ালার ঘোষনা হচ্ছেঃ- নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরির্বতন ঘটান না- যতক্ষন না তারা তাদের অবস্থার পরির্বতন ঘটায়। সূরা রাদ,আয়াত নং–১১

সুতরাং আমাদের উপর ওয়াজিব হল নিজেদের কে ইবনে কাসিমের মত করে গড়ে তোলা। যদি পরিপূর্ন ভাবে সম্ভব নাও হয় সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং নিজেদের আওতাধীন সান্তানাদি এবং শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তোলার চেষ্ঠা করা। সমবয়সী জুনিয়র সিনিয়র সকলকেই এ ব্যপারে উদ্ধুদ্ধ করা- এভাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখলে ইনশাআল্লাহ একদিন আমাদের মধ্য থেকেই ইবনে কাসিমের দেখা মিলবে। এসব কিছুর পরও যদি নিজেরা– ইবনে কাসিমের মত হতে না পারলাম এবং নিজেদের মধ্য থেকেও তাঁর মত কেউ না হল– তাহলে কি আমরা বসে থাকবো? জিহাদ তো সেই নবী যমানা থেকে ছিল এবং কিয়ামত অবধি থাকবে– সব যুগেই কি ইবনে কাসিমের অস্তিত্ব ছিল? ছিল না; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের নির্দেশ হল– প্রতিটি সৎ এবং অসৎ, আদেল এবং জালিম–এর অধিনে থেকে জিহাদ চালিয়ে যাও। সুতরাং আমাদেরও উচিত এধরনের অযথা এবং অযৌক্তিক কথা বার্তা ছেড়ে কাজের কাজ করা। আর এ যুগে ইবনে কাসিমের মত আমাদের কোন নেতা নেই এ কথাটাও তো অবাস্তব। এ যুগের বিন লাদেন কি সে যুগের বিন কাসিমের চেয়ে কোন অংশে কম? এ যুগের আইমান আয–যাওহিরী কি সে যুগের সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে কম? এ যুগের মোল্লা ওমর কি সে যুগের ওমর ইবনে আব্দুল আযিযের চেয়ে কম ?

সে যুগের গোটা মুসলিম বিশ্ব (তৎকালিন সুপার পাওয়ার) বিন কাসিমের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। বিশেষ সাধারণ সব মানুষ তার কল্যানকামী এবং হিতাকাংক্ষী ছিল, মুসলিম মায়েরা তাঁদের ছেলেদের কে জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের করে দিতেন। বের করে দিতেন স্ত্রীরাও তাদের স্বামীদেরকে, বোনরাও তাদের ভাইদের কে। তৎকালীন নারীরা নিজেদের সকল "জেওর" এবং অর্থাদি জিহাদ এবং মুজাহিদদের জন্য অকুন্ঠ চিত্তে ব্যয় করতেন। আর এ যুগের বিন লাদেনের পক্ষে কয়জন এবং বিপক্ষে কারা। তারপরও বিন লাদেন গোটা বিশ্বের সাথে একনাগাড়ে জিহাদ করে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে স্বীয় রবের দরবারে পারি জমিয়েছেন। বিন কাসিমের মত অনুকূল না হলেও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. এর অবস্থাও মোটামোটি তার অনুকূলেই ছিল- সিরিয়া এবং মিশরের মত বিরাট সাম্রাজ্য তাঁর অধীনে ছিল- ছিল মোটামোটি শক্তিশালী সেনা বাহিনী এবং গোয়েন্দা বাহিনীও। কিছু সংখ্যক মুনাফিক শয়তান ছাড়া প্রায় সব মুসলমানরাও ছিল তার মুয়াফেক। আর আজ যখন আইমান আয্-যাওয়াহিরী পুরো বিশ্বের সাথে লড়ে যাচ্ছেন তখন তাঁর সহযোগী বলতে আমরা কাউকেই দেখিনা। বরং আমাদের মধ্য থেকে যারা বড় গলায় বলে-ইমাম মাহ্দী আসলে সবার আগে আমিই তাঁর সাথে হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো,' তারাও আজ খুবই নির্লজ্জভাবে ইমাম মাহদীর মহান এই অগ্র সেনাপতিকে বিশ্ব সন্ত্রাস, জঙ্গী নেতা ইত্যাদি বলে প্রত্যাখান করছে-আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

সে যুগের ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ ছিলেন একটি পরিপূন শক্তিশালী এবং তৎকালীন সুপার পাওয়ার ইসলামী খেলাফতের মহান খলিফা। খলিফা হয়ে তিনি তার জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তুলেন পৃথিবীর অন্যতম যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী) রূপে। এটিই হল তার জীবনের অন্যতম এবং সবচেয়ে আলোচিত দিক- অপরাপর গুনাবলীতে ও তিনি ছিলেন অনন্য (আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদায় ভূষিত করুন) কিন্তু এই যুগের আমিরুল মু"মিনীন মোল্লা ওমরের কথা কয়জনই বা খবর রাখে। এযাবত কালের পৃথিবীর এই মহান যাহেদ শাসক শুধু এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য নিজের ক্ষমতা নিজ ইচ্ছায় ছেড়ে দিলেন এবং গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘস্থায়ী জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন।

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ, গাজী সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহঃ এবং মুহাম্মাদ ইবনের কাসিম রহঃ তাঁরা সবাই ইসলামী ইতিহাসের অনন্য সাধারণ ব্যাক্তিত্ব, তাঁদের তুলনা তাঁরাই। তাদের অবদান মুসলিম জাতি কেয়ামত পর্যন্ত স্মরণ রাখবে। আমরা এই মহান ব্যক্তিদের সাথে এই যুগের ইমাম মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেন, মুহসিনে মিল্লাত শায়খ আইমান আয-যাওহিরী এবং আমিরুল মু'মিনীন আল-মুনতাসির বিইয্নিল্লাহ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিঃ কে তুলনা করে ঐ সকল মহান ব্যক্তিদের মর্যাদা কে খাঁটো করতে চাইনি। শুধু এতটুকু বুঝাইতে চেয়েছি যে, এই যুগেও আল্লাহ তায়ালা অনেক বড় বড় মহান ব্যক্তিদের আগমন ঘটিয়েছেন এবং বরাবর ঘটিয়ে চলছেন যারা দুনিয়া কে পুনরায় খিলাফত আলা-মিনহাজিন্নুবুওয়াহ এর মডেলে সাজিয়ে তোলার জন্য নিজেদের জীবনকে তিলে তিলে বিলীন করে চলছেন। আমাদের উচিৎ তাদের কে চেনা,তাদের পথ এবং মতকে বুঝা এবং ইসলামের জন্য আল্লাহ রাহে নিজেদের কে শামিল করে নেয়া। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। সত্য কে সত্য বুঝার এবং তাতে অংশ গ্রহনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমরা সেই জাতি

আমরা মুসলিম জাতি, বীরের জাতি জিহাদী জাতি, দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'আমরা তরবারির ছায়ায় প্রতিপালিত একজাতি।' বহু শত বছর আমরা পৃথিবী শাসন করেছি। একদিকে আমরা যেমন জালিমকে দমন করে মজলুমকে জুলুম নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি দান করেছি। অন্য দিকে ইউরোপসহ গোটাবিশ্ব যখন বর্বরতা আর মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখনও মানজাতিকে মানবতা আর সভ্যতার শিক্ষা আমরাই দান করেছি। তাই বিশ্বের অন্য সকল জাতি মুসলিম জাতিকে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে।

কিন্তু আজ অবস্থা ভিন্ন রকম। মুসলিম জাতি আজ দুর্বল ও শক্তিহীন। এখন যারা বিশ্বকে শাসন করছে তাদের কাছে আমাদের জান-মাল খুব সস্তা, ইজ্জত-আবরু আরো সস্তা। আমরা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনা। কোন জাতি আমাদেরকে ভয় করেনা, আমরা সব জাতিকে ভয় করি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের রক্ত ঝরছে, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হচ্ছে। এমন কি বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদেরকে জাতিগত ভাবে নির্মূল করা হচ্ছে এবং জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে; কিন্তু আমরা রুখে দাঁড়াতে পারিনা, সামান্য একটু প্রতিবাদ করতেও সাহস পাইনা।

কেন এমন হলো আমাদের অবস্থা? দৃষ্টি যাদের স্থূলতার সীমানায় আবদ্ধ তারা তো বিভিন্ন কারণ বলে থাকে এবং প্রতিকারেরও বিভিন্ন উপায় বাতলে থাকে। কিন্তু কবির ভাষায়- 'যতই ঔষধ প্রয়োগ করি রোগ ততই বাড়ে।' আর যারা অন্তরদর্শী তাঁরা বলেন, আমাদের যিল্লতির কারণ এই যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের চরিত্র হারিয়ে ফেলেছি। নিজেদের অতীত ইতিহাস ও আত্মপরিচয় ভুলে গিয়েছি।

এ মহাসত্যকে পারস্যের সাধক কবি মাওলানা রুমি অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন একটি গল্পের মাধ্যমে। "এক বাঘিনী তার ব্যাঘ্র-শাবক রেখে মারা গেলো। আরেক বকরী তাকে পরম যত্নে লালন পালন করলো। ফলে ব্যাঘ্র শাবক নিজেকে ছাগল ছানা ভাবতে শুরু করলো এবং ছাগল ছানাদের সাথে মাঠে চরে বড় হতে লাগলো, কিন্তু ব্যাঘ্র শাবক ছাগল ছানাদের যতই আপন ভাবে এবং তোয়াজ করে তাদের সাথে মিলে মিশে থাকতে চায়, ছাগল ছানারা ততই তাকে জ্বালাতন করে। তবু ব্যাঘ্র শাবক ছাগল ছানাদের সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যায়।

তারপর এলো সেই দিন, যেদিন ইয়া বড় এক বাঘ দূর থেকে দেখতে পেলো ব্যাঘ্র শাবকের উপর ছাগল ছানাদের অত্যাচারের করুণ দৃশ্য। দেখে তো বনের বাঘ ক্রোধে আত্মহারা। তাই সে ছুটে এলো এক হুংকার দিয়ে। সেই হুংকারে ছাগল ছানারা যে যেদিকে পারে পালায়। ব্যাঘ্র শাবকও ভয়ে পালাতে চাইলো, কিন্তু বাঘ তাকে ধরে ফেলল খপ করে। ব্যাঘ্র শাবক প্রাণের ভয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চেচায়। বাঘ তখন শাবকটিকে ধরে এক কুয়ার ধারে নিয়ে গেলো এবং পানিতে তার চেহারা দেখিয়ে বললো, তুমি তোমার আত্মপরিচয় ভুলে গিয়েছ, তাই আজ তেমার এমন লাঞ্ছনার জীবন। পানির আয়নায় একবার তাকিয়ে দেখো, কে তুমি? কী তোমার আসল পরিচয়?

কুপের পানিতে নিজের চেহারা দেখে ব্যাঘ্র শাবকের ভুল ভাঙ্গলো এবং সে তার আত্মপরিচয় খুঁজে পেলো। ব্যাঘ্র শাবক তখন বাগের মতই হুংকার দিয়ে উঠলো। সেদিন থেকে ছাগল ছানাদের অত্যাচার তো বন্ধ হলোই, বরং দূর থেকে ব্যাঘ্র শাবক দেখা মাত্র ছাগল ছানারা প্রানের ভয়ে ছুটে পালায়।

আমরা মুসলিম জাতি, বীরের জাতি জিহাদী জাতি, দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'আমরা তরবারির ছায়ায় প্রতিপালিত একজাতি।' বহু শত বছর আমরা পৃথিবী শাসন করেছি। একদিকে আমরা যেমন জালিমকে দমন করে মজলুমকে জুলুম নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি দান করেছি। অন্য দিকে ইউরোপসহ গোটাবিশ্ব যখন বর্বরতা আর মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখনও মানজাতিকে মানবতা আর সভ্যতার শিক্ষা আমরাই দান করেছি। তাই বিশ্বের অন্য সকল জাতি মুসলিম জাতিকে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে।

কিন্তু আজ অবস্থা ভিন্ন রকম। মুসলিম জাতি আজ দুর্বল ও শক্তিহীন। এখন যারা বিশ্বকে শাসন করছে তাদের কাছে আমাদের জান-মাল খুব সস্তা, ইজ্জত-আবরু আরো সস্তা। আমরা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনা। কোন জাতি আমাদেরকে ভয় করেনা, আমরা সব জাতিকে ভয় করি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের রক্ত ঝরছে, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হচ্ছে। এমন কি বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদেরকে জাতিগত ভাবে নির্মূল করা হচ্ছে এবং জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে; কিন্তু আমরা রুখে দাঁড়াতে পারিনা, সামান্য একটু প্রতিবাদ করতেও সাহস পাইনা।

কেন এমন হলো আমাদের অবস্থা? দৃষ্টি যাদের স্থুলতার সীমানায় আবদ্ধ তারা তো বিভিন্ন কারণ বলে থাকে এবং প্রতিকারেরও বিভিন্ন উপায় বাতলে থাকে। কিন্তু কবির ভাষায়- 'যতই ঔষধ প্রয়োগ করি রোগ ততই বাড়ে।' আর যারা অন্তরদর্শী তাঁরা বলেন, আমাদের যিল্লতির কারণ এই যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের চরিত্র হারিয়ে ফেলেছি। নিজেদের অতীত ইতিহাস ও আত্মপরিচয় ভুলে গিয়েছি।

মুসলিম জাতির অবস্থাও হয়েছে সেই ব্যাঘ্র শাবকের মত। আমরা মুসলিম জাতি সিংহের জাতি, আমরা ব্যাঘ্র শাবক, কিন্তু আত্মবিস্মৃতির কারনে পৃথিবীর ছাগল ছানাদের হাতে আমাদের এত যিল্লতি, এত লাঞ্চনা। কিন্তু একবার যদি আমরা আমাদের আত্মপরিচয় খুঁজে পাই, ইতিহাসের আয়নায় একবার যদি নিজেদের চেহারা দেখতে পাই আর বাঘের মত হুংকার দিয়ে উঠতে পারি, তাহলে সেই ব্যাঘ্র শাবকের মত আমাদেরও অবস্থার পরিবর্তন হবে। পৃথিবীর ছাগল ছানার অত্যাচার করা তো দূরের কথা, ভয়ে দিগ্বিদিক ছুটে পালাবে। আমাদের ইতিহাস তো বদর-উহুদের ইতিহাস, ইয়ারমুক কাদিসয়ার ইতিহাস। আমরা তো আল্লাহর তরবারি খালিদের অনুসারী। স্পেন বিজেতা বীরসেনানী তারিক বিন যিয়াদের আদর্শের পতাকাবাহী। আর সতের বছরের কিশোর সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিমের জিহাদি কাফেলার সৈনিক। আমাদের উত্থান তো হয়েছে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে বের করে আনতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার পরম প্রশস্ততার দিকে ফিরিয়ে আনতে এবং অন্য সব বাতিল ধর্মের যুলুম নির্যাতন থেকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ইনসাফের দিকে বের করে আনতে।

আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি, যিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, যিনি সর্ব শক্তিমান। আমরা তো আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করিনা। বুকে আমাদের তাওহিদী আমানত, এত সহজ নয় পৃথিবীর বুক থেকে আমাদের নিশ্চিহ্ন করা। জিহাদের জযবায়, শাহাদাতের তামান্নায় আমরা মৃত্যু ভয়হীন। আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী, আমরা মুসলিম জাতি একদেহ এক প্রাণ। আমরা কেন লাঞ্চিত হবো, লুণ্ঠিত হবো? পৃথিবীর শাসক না হয়ে আমরা কেন শাসিত হবো? পৃথিবীর শিক্ষক না হয়ে আমরা কেন ছাত্র হবো, আর মাষ্টার মশায়ের হাতে বেত খাবো, কানমলা খাবো?

আমরা মুসলিম, আমাদের শক্তি ঈমানী শক্তি, আমরা আল্লাহর বলে বলিয়ান। আমরা আল্লাহর সকল বিধান পালনে সদা বদ্ধপরিকর। চাই সে বিধান পালন করতে আমাদের যতই (কুরহুন) অপছন্দ/কঠিন মনে হোক না কেন? এই তো আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ (আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন) এর ঈমানদীপ্ত বানীর সত্যতা দেখতে পাই, যখন তিনি আফগানিস্তানে ক্রুসেড যুদ্ধের শুরুলগ্নে বলেছিলেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন আর বুশ আমাদেরকে পরাজিত করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে। শিঘ্রই আমরা দেখে নিবো কার ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়।

নিশ্চয়ই, আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। আর হ্যাঁ, এই প্রতিশ্রুতি চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও পূর্বের ন্যায় বহাল রয়েছে। আর যার ইচ্ছা সে চর্ম চোখে দেখে নিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা কিভাবে এই কিতাল-এর আমলের মাঝে শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন। যে আমেরিকা, এত দিন স্বপ্ন দেখতো যে, আফগানিস্তান কে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিবে সেই আমরিকাই আজ দেখতে পাচ্ছে, পৃথিবীর বুকে আজ আরো বহু আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। গতকালের ফিরআউন তূল্য আমেরিকা কিছুদিন আগেও আমাদেরকে তার আক্রমনের হুমকি দিতো, কিন্তু আজ, সোমালিয়া, ইয়েমেন, ও সিরিয়ায় আমাদের আহবান সত্ত্বে ও আসতে ভয় পাচ্ছে, কারণ আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি, আমাদের বিজয় আল্লাহর বিধানের উপর অটল অবিচল থাকার মাঝে। যদি আমরা আল্লাহর বিধানের/কিতালের উপর হিমালয় পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থাকি তাহলে সব তাগুতি শক্তির দাপট, অহংকার মাটির সাথে মিশে যাবে। অত এব, আজ আমাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে ঘোষিত হোক, মুসলিম আমি, সংগ্রামী আমি, আমি চির রনবীর, আল্লাহ কে ছাড়া কাউকে মানিনা নারায়ে তাকবীর মুসলিম প্রতিটি শিশু-কিশোরের মুখে ধ্বনিত হোক, এক লাদেন বিন লাদেন যদি মরে যায় লক্ষ কোটি জন্ম নেবে সারা দুনিয়ায় এর শ্লোগান।

এখন তোমরা যারা শিশু-কিশোর, তোমরা হলে ইসলামের ব্যাঘ্র-শাবক। উঠো, জাগো। ইতিহাসের আয়নায় একবার নিজেদের চেহারা দেখো জীবন গড়ে তোলো বদরের কিশোর সাহাবী মুয়ায ও মুআওয়াযের মত যাদের তরবারি লাল হয়ে ছিল আবু জাহেলের খুনে।

জীবন গড়ে তোলো অহুদের তরুন সামুরা ও নাফের মত যাদের জিহাদী জাযবা ও শাহাদাতের আকাঙক্ষার ইতিহাস আজো কাফিরদের বুকে কাঁপন ধরায়।

উঠো, জাগো এবং তোমাদেরই বয়সী সিন্ধু বিজেতার মত হুংকার দিয়ে বলো- আল্লাহ আকবার। ইনশাল্লাহ তোমাদের হাতে বাতিলের দূর্গ মিসমার হবে, ইসলামের বিজয় পতাকা দিকে দিকে আবার উড্ডিন হবে। মুসলিম জাতি তোমাদের সাহসে আবার মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবে। খুব বেশী দূরে নয় সেদিন, তোমাদেরকে বাঁধা দিবে এমন শক্তি নেই ইনশাআল্লাহ। কিন্তু বড়দের মত তোমরাও যদি ঘুমিয়ে থাকো, কিংবা ব্যাঘ্র-শাবক হয়েও ছাগল ছানার মত ভ্যাঁ ভ্যা করো তাহলে.....। আল্লাহ তাআলা রক্ষা করুন।



যে আফিয়া সিদ্দিক্বীকে আমি দেখেছি

তারেক মেহান্না

'আফিয়া সিদ্দিক্বীর ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে একটা কথা জানাতে চাই। যারা এই মহিলাকে কাছ থেকে দেখেছেন, ইসলামের জন্য তার ভালোবাসা ও উৎসর্গের গল্পগাঁথা জানেন, তারা এও জানেন যে, ইসলামের জন্য আফিয়া খুব সহজে এবং অনায়াসে যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও খুব অল্প কিছু মানুষই এমন ত্যাগ স্বীকার করার সৎসাহস দেখায়।

'নিরাপত্তার জন্য আফিয়া বিরাট হুমকিস্বরূপ'
-ক্রিস্টোফার লাভিন, সহকারী ইউএস এটর্নি, অগাস্টের ১১ তারিখে বিচারককে উদ্দেশ্যে করে এই কথাটি বলেন। আফিয়াকে তার গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থানের চিকিৎসা থেকে বিরত রাখার জন্য এই কথাটি বলা হয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদলে ছিল সেসব মুসলিম যারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজ দেশ বা সমাজের মানুষদের সাথে থেকে যায় এবং তাদের ধর্মচর্চা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি অর্থাৎ নামায, রোযা, কালেমা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্যদলটি ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা দ্বীনের খাতিরে হিজরত করেছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সামরিক মহড়া ও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। একাধিক হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'ধরনের মুসলিমদের সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা দেননি। যেমন, মুসলিম এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বাহিনীর নেতা বা আমীর নির্বাচন করার সময় শত্রুদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছে তাদের সাথে কী-রূপ আচরণ করতে হবে এ ব্যাপারে তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 'তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাও যেন তারা তাদের দেশ (ভূমি) ছেড়ে মুহাজিরিনদের ভূমিতে হিজরত করে চলে আসে, এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও, যদি তারা এমনটি করে, তাহলে তারা মুহাজিরিনদের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। যদি তারা হিজরত করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, সেক্ষেত্রে তারা বেদুইনদের সমমর্যাদা লাভ করবে, আর তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার সেইসব হুকুমগুলো প্রযোজ্য হবে যেগুলো অন্য মুসলিমদের উপরেও প্রযোজ্য হয়'।

এই পার্থক্যকরণটি খুব সুস্পষ্ট। কারণ এখানে একটি দল নিজেদের কাঁধে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব তুলে নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। অপরদিকে অন্য দলটি ইসলামের ব্যক্তিগত বাধাধরা এবং ঝুঁকিমুক্ত কাজগুলোর মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে। মূলকথা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন মুসলিমদের ইসলামচর্চাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন: মুহাজিরিনদের দ্বীন বা দ্বীনুল মুহাজিরিন, যারা দ্বীনকে সহায়তা ও দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং বেদুইনদের দ্বীন বা দ্বীনুল আরাবে, যারা কেবল দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলতেন।

যদিও এ বাস্তবতা হাজার বছর আগের, তথাপি এটাই চির বাস্তবতা যে মুসলিমদের মধ্যে এ দুটি শ্রেণী বিরাজমান থাকবে। কাজেই, যে কেউ লক্ষ করলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম-পালন-করা-মুসলিমদের (practicing Muslims) মাঝেও এ পার্থক্যটি আবিষ্কার করবে। অতীতের সেই দ্বীনুল আরাবকে সে ইসলামের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে ইসলামচর্চা গতানুগতিক সেই পাঁচটি স্তর অর্থাৎ কালেমা-নামায-রোযা-যাকাত-হাজ্জ, হালালভাবে জবেহকৃত পশু খাওয়া আর স্থানীয় মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা-এসবের মাঝে সীমিত। এ ধরনের মুসলিমই যখন পশ্চিমা দেশে খুঁজে পাওয়া দায়, তখন আপনি যদি

পশ্চিমা দেশে এমন কারো দেখা পান, যিনি গতানুগতিক ধারার ইসলামকে ছাড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে দ্বীনুল মুহাজিরীনদের দলে জায়গা করে নিয়েছেন, তাকে দেখে কি আনন্দে আপনার চোখে জল আসবে না? ভেবে দেখুন কত চমৎকার একজন মুসলিম হলে পশ্চিমা দেশে থেকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাত নয়, বরং চিন্তার জগত পুরো উম্মাহকে জুড়ে বিস্তৃত হয়! এই অগ্রপথিকেরা অন্যান্যদের এগিয়ে এসে উম্মাহর সক্রিয় সদস্য হতে উৎসাহিত করেন এবং রাতদিন সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যান। শত ব্যস্ততার ভীড়েও তারা ক্ষান্ত হন না বরং তাদের হৃদয় স্পন্দিত হয় তার মুসলিম ভাইবোনদের সাথে ঐক্যতানে। তারা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে জানে এবং তাদের পরোয়া করে না যারা কেবল খায় আর গবাদিপশুর মত বেঁচে থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে,

هكذا الاحرارفي دنياالعبيد

'দাসত্বের এই দুনিয়ায় তারাই হল মুক্ত স্বাধীন'

এমনই এক মানুষকে ঘিরে সারা বিশ্বজুড়ে তোলপাড় চলছে। সেই মানুষটি একইসাথে একজন ছাত্রী, স্ত্রী ও তিন সন্তানের মা। ক্ষীণকায়, ছোটখাট সেই মানুষটির নাম আফিয়া সিদ্দিক্বী।

আমি খুব করে চাই এ মানুষটির গল্প আপনারা শুনুন! তার গল্প আমার হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে, তাই আমি চাই আপনারাও উপলব্ধি করুন কেন এই মানুষটির গল্প আমাকে প্রভাবিত করেছে। যারা তাকে চেনেন তারা জানেন, ইসলামের জন্য আফিয়া খুব সহজভাবে এবং অনায়াসে যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও খুব অল্প কিছু মানুষই এমন ত্যাগ স্বীকার করার সৎসাহস দেখায়।

আফিয়া ছিলেন ছোটখাট, শান্ত, ভদ্র এবং লাজুক এক নারী। হৈ-হুল্লোড় কিংবা সভাসমাবেশে খুব কমই তিনি মানুষের চোখে ধরা দিতেন। কিন্তু, প্রয়োজনের সময় তিনি ঠিকই সাড়া দিতেন, আর যে কথাগুলো বলা প্রয়োজন সেগুলোই সবাইকে বলতেন। একবার বসনিয়ার এতিম শিশুদের জন্য তহবিল সংগ্রহের দরকার পড়ল, সেখানে স্থানীয় এক মসজিদে আফিয়া তার বক্তৃতায় কড়া ভাষায় পুরুষদেরকে তিরস্কার করলেন। পুরুষ হয়ে কেন তারা বসে আছে আর নারী হয়ে আফিয়াকে তহবিল সংগ্রহের কাজ করতে হচ্ছে? তিনি সবার কাছে আর্তি জানালেন, 'পুরুষরা কোথায়? আমাকে আজকে কেন একা দাঁড়িয়ে এসব কাজ করতে হচ্ছে?' তিনি ঠিকই বলেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন মা, স্ত্রী এবং ছাত্রী। আর তার চারপাশে ছিল এমন সব পুরুষ, ইসলামের কাজের কথা উঠলেই যাদের আর দেখা পাওয়া যেত না।

MIT'র ছাত্রী থাকাকালীন আফিয়া স্থানীয় মুসলিম কারাবন্দীদের কাছে কুরআনের কপি ও ইসলামী বইপত্র গাড়িতে করে পৌছাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় মসজিদে বইগুলোকে আনিয়ে নিতেন। তারপর ভারি বইগুলো বাক্সবন্দী করে মসজিদের খাড়া সিঁড়ি ভেঙে পুরো তিনতলা পাড়ি দিয়ে নিজ হাতে সেগুলো জেলে জেলে পৌঁছে দিতেন। সুবহানআল্লাহ, যেই মানুষটি মুসলিম কারাবন্দীদের সাহায্য করতে নিজে এত সময় আর শ্রম ব্যয় করেছেন সেই তিনি নিজেই আজ একজন কারাবন্দী (আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি যেন তিনি মুক্ত হতে পারেন)!

ইসলামের প্রতি তার একনিষ্ঠতা ক্যাম্পাসেও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ত। বোস্টন ম্যাগাজিনের ২০০৪ সালের একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করেছে, 'যারা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেয়, তাদের জন্য আফিয়া তিনটি গাইড লিখেছেন। গ্রুপের ওয়েবসাইটে তিনি শিক্ষা দিতেন কিভাবে একটি দা'ওয়াহ টেবিল পরিচালনা করতে হয়, কিভাবে স্কুলের ইনফরমেশন বুথগুলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায়।' সেই প্রবন্ধটি আফিয়ার গাইডের কিছু কথা উদ্ধৃত করেছে। তিনি সেখানে লিখেছিলেন, 'ভেবে দেখুন! আমাদের এই বিনম্র কিন্তু আন্তরিক দা'ওয়াহর প্রচেষ্টা থেকেই একটি সুবিশাল দা'ওয়াহ আন্দোলন জন্ম নিতে পারে! একটু ভেবে দেখুন! আর এই আন্দোলনের হাত ধরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের সকলের পুরস্কার আমাদের খাতাতেও জমা হবে! বৃহৎ পরিসরে চিন্তা করুন এবং বড় পরিকল্পনা হাতে নিন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং কাজে আন্তরিকতা ঢেলে দেন যাতে করে আমাদের এই বিনম্র প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং ছড়িয়ে পড়তে থাকে যতদিন না এই আমেরিকা একটি মুসলিম দেশে পরিণত হয়।'

আল্লাহু আকবর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখুন! তার আকাশ-ছোঁয়া আশা আর পাহাড়সম স্বপ্ন! পুরুষ হয়ে যদি এক নারীর কাছে এমন স্বপ্ন দেখা শিখতে হয় তবে তো আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

তনি প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবারে তার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন স্থানীয় মুসলিম শিশুদের ক্লাস নিতে। এক বোন থেকে জানতে পারি, প্রতি সপ্তাহে আফিয়া গাড়ি নিয়ে বের হতেন এবং নও মুসলিমদের একটি ছোট্টদলকে তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির উপর শিক্ষা দিতেন। আফিয়ার ক্লাস করতেন এমন এক বোন বলেন, 'তিনি নিজে যেমন, তেমনই থাকতেন, বিশেষ কিছু করে কারো নজরে আসতে চাইতেন না বা বিশেষ কারো সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর ব্যাপারে অগ্রহী ছিলেন না। তিনি শ্রেফ আমাদের কাছে আসতেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। অথচ ইংরেজি তার মাতৃভাষাও ছিল না!'

আফিয়ার হালাক্বায় (ক্লাস) অংশ নিতেন এমন আরেক বোন বলেন, 'আফিয়া আমাদেরকে বলতেন, মুসলিম পরিচয় নিয়ে আমাদের লজ্জিত হবার কিছু নেই। তিনি বলেছিলেন, 'দুর্বলদের প্রতি আমেরিকানদের কোনো সম্মান নেই। যদি আমরা উঠে দাঁড়াই এবং শক্তিশালী হই, তখন তারা আমাদেরকে ঠিকই সম্মান দেখাবে।'

কিন্তু এসব কিছুর মাঝেও, আফিয়ার সবচেয়ে বেশি অনুরাগ কাজ করত বিশ্বের নানাপ্রান্তের শোষিত ও নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতি। বসনিয়ায় যখন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল, তিনি তখন পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকেননি বরং, তিনি তৎক্ষণাৎ হাতের কাছে যা পেয়েছেন তা নিয়ে সাধ্যের মধ্যে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিলেন। সারাদিন ঘরে বসে বসনিয়া গিয়ে ব্যাপক ত্রাণকার্যক্রম চালাবার মত আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখার মানুষ আফিয়া ছিলেন না। বরং তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাই করলেন যা তার সাধ্যে আছে: মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে তাদের সাথে বসনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন, ডোনেশন যোগাড় করলেন, ই-মেইল করলেন, স্লাইডশো-তে বসনিয়ার অবস্থা উপস্থাপন করে সবার মাঝে সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করলেন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তা হল, আফিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে একটা জিনিষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি আমরা আমাদের নিপীড়িত ভাই-বোনদের জন্য কিছু একটা করতে চাই, আমাদের কিছু-না-কিছু অবশ্যই করার থাকবে। নিদেনপক্ষে, যারা অজ্ঞ, তাদের মধ্যে আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাই-বোনদের উপর কী ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে সচেতনতা অন্তত সৃষ্টি করতে পারি। হাত গুটিয়ে পেছনে পড়ে থাকা কোন কাজের কথা নয়। একবার আফিয়া স্থানীয় মসজিদে বসনিয়ার এতিমশিশুদের জন্য সাহায্য চেয়ে বক্তব্য রাখছিলেন। তার কথা শুনে শ্রোতাদের তেমন কোন ভাবাবেগ হল না, তারা তার কথা শুনে স্রেফ বসেই ছিল। তখন আফিয়া জিজ্ঞেস করলেন: 'এই রুমে যতজন মানুষ আছে, তাদের ক'জনের একজোড়ার বেশি জুতো আছে?' রুমের প্রায় অর্ধেক মানুষ হাত তুলল। তিনি বললেন, 'তো আপনারা এগিয়ে আসুন বসনিয়ার শিশুদের জন্য! যারা একটি কঠিন শীত পার করতে যাচ্ছে!' তার আর্তি এতটাই জোরালো ছিল যে মসজিদের ইমাম পর্যন্ত তার জুতোজোড়া খুলে দান করে দেন!

ইসলামের জন্য এ নারীর তীব্র আবেগ আর ভালবাসার গল্পের আরো অনেকটুকু আছে। তবে আফিয়া কেমন ছিলেন তা বোঝার জন্য উপরের উদাহরণগুলোই যথেষ্ট এবং আশা করি নারী হিসেবে তার ত্যাগের যে গল্প তা বোনদের আগে ভাইদেরকে নাড়া দেবে, তাদেরকে ইসলামের সেবায় যা-কিছু-আছে তাই নিয়ে নেমে পড়তে অনুপ্রেরণা যোগাবে। মনে রাখবেন, তিনি তার সব কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন তিনি ছিলেন একজন মা এবং একজন পিএইচডি ছাত্রী। আর আমাদের হাতে আরো বেশি সময় থাকা সত্ত্বেও তার কাছাকাছিও কিছু করছি না।

আফিয়ার এ প্রতিচ্ছবিকে মনের মধ্যে গেঁথে যখন আমি আদালতের শুনানিতে আফিয়াকে দেখতে পেলাম তখন আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। আদালতকক্ষের সামনের বামের দরজাটা হালকা করে খুলে যাওয়ার পর নীল হুইলচেয়ারে বসা দুর্বল, নিস্তেজ, প্রবল-পরিশ্রান্ত এক নারী আমাদের সবার সামনে উপস্থিত হল। তিনি তার মাথাটি সোজা করে ধরেও রাখতে পারছিলেন না। তার পরনে ছিল গুয়ানতানামো ধাঁচের গোলাপী কারাপোষাক, আর তার মাথা মোড়ানো সাদা হিজাবে, যেটা দিয়ে তার অস্থিসার হাতদুটো ঢাকা (কারাগারের ইউনিফর্মে হাতাকাটা থাকে)। তার উকিল দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বসার পর জামিনের জন্য শুনানি শুরু হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের কুশলি, সহযোগী ইউএস এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিন, তিন-চারজন এফবিআই এজেন্টকে সাথে নিয়ে হেঁটে আসলেন, তাদের মধ্যে এক মহিলা ছিল যাকে পাকিস্তানীর মত দেখাচ্ছিল (আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক এই দালালের প্রতি)। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিবাদী উকিল বললেন, জামিনের আবেদনে শুনানি দেরি হবার কারণ হল আফিয়ার শরীরের করুণ হাল। আফিয়ার উকিল মূলত বলতে চাইলেন, আফিয়ার এ মুমূর্ষু অবস্থায় জামিন নয়, বরং সবকিছুর আগে তাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করানো হোক। লাভিন উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি জানাল, বলল আফিয়া আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। বিচারক সে কথা খুব একটা আমলে নিলেন বলে মনে হল না। ফলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি বলে চললেন, 'এ এমন এক নারী যে বন্দী অবস্থায় বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে'। একথা শুনেই আমি আফিয়াকে দেখলাম এবং লক্ষ করলাম আফিয়া খুব হতাশা আর কষ্ট নিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, যেন সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, আফিয়া ছিলেন খুব ছোটখাট আর তিনি এতটাই নুয়ে পড়েছিলেন, আমি কেবল তাকে পেছন থেকে হুইলচেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সামান্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি শুধু এতটুকুই দেখেছি তার মাথা বাম দিকে ঝুঁকে পড়েছে, হিজাবে তার মাথা মোড়ানো এবং ডান হাত বের হয়ে আছে।

তিনি কেন এতটা মনোকষ্টে জর্জরিত আর বিষাদগ্রস্ত ছিলেন তা আমি বুঝতে পেরেছি যখন তার উকিল তার শারীরিক অবস্থা বিশদভাবে তুলে ধরলেন:

- আমেরিকার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় তার ব্রেইন ড্যামেজ হয়েছে।
- আমেরিকান সরকারের অধীনে থাকাকালীন সময়ে তার একটি কিডনী সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
- তিনি খেতে পারছেন না কেননা অপারেশনের সময় তার অন্ত্রের কিছু অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এটিও ঘটেছে আমেরিকান প্রহরায়।
- গুলিবিদ্ধ স্থানের সার্জারি করতে গিয়ে তার শরীরের প্রলেপের পর প্রলেপ জুড়ে সেলাই করা হয়েছে।
- তার শরীরে বুক থেকে শুরু করে পুরো ধড় জুড়ে অস্ত্রোপচারের বিশাল ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

এ সব যন্ত্রণা নিয়ে, আমেরিকায় কারারুদ্ধকালীন পুরো সময়জুড়ে তাকে একবারও ডাক্তার দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। আফগানিস্তানে তার অযত্ন-অবহেলায় অপারেশনের পর তার পেটে অবিরত অসহ্য ব্যথা হবার পরেও না। বরং এই ব্যথার জন্য তাকে দেওয়া হয়েছে আইবোপ্রোফেন নামের একটি ব্যথানাশক ঔষধ, যেটা কিনা লোকে খায় মাথাব্যথার জন্য!

এসব কিছুর পরেও, সরকারপক্ষের আইনজীবি বেহায়া এবং নির্লজ্জের মত তাকে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখার আস্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন, যুক্তি দেখিয়ে চললেন আফিয়া নাকি 'নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ'। যখন বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আফিয়াকে এভাবে একদম প্রাথমিক চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত রাখা হল, তখন এটর্নি সাহেব তোতলাতে শুরু করলেন এবং বললেন, 'আসলে তখন পরিস্থিতি খুব জটিল আকার ধারণ করেছিল', এবং নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য প্রত্যাশিতভাবেই অত্যন্ত সস্তা একটা কুযুক্তি ধার করলেন, 'এটি আফিয়ার নিজের সিদ্ধান্ত যে তিনি পুরুষ ডাক্তারের কাছে নিজেকে দেখাতে চাননি'। আইনজীবি যখনই একথা বললেন, আফিয়া তাঁর জীর্ণশীর্ণ হাত তুলে অতিকষ্টে ডানে-বামে নেড়ে যেন বিচারককে বলতে চাইলেন, 'না! সে মিথ্যে বলছে!'। আমার খুব কষ্ট লাগল। চোখের সামনে এভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ঝুরি ঝুরি মিথ্যা বলতে দেখে আফিয়ার চেহারায় প্রচণ্ড হতাশার ছাপ দেখা দিল। তার আইনজীবি তখন তার কাছে গিয়ে তার হাতটি ধরে পায়ের উপর বসিয়ে দিলেন এবং হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন।

শুনানি যখন শেষ হল, আমার মাথায় তখন ইবনুল কায়্যিম রহ. এর একটি সুগভীর উক্তি বারবার মনে পড়তে লাগল, তিনি বলেছিলেন, একজন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না, 'শেষ প্রতিবন্ধকটি অবশিষ্ট থাকবে যা থেকে শয়তান তাকে তাড়া করে এবং বান্দাকে অবশ্যই এই প্রতিবন্ধকের মোকাবেলা করতে হবে। যদি কেউ এই বাধা থেকে রক্ষা পায় তাহলে তারা হলেন আল্লাহর নবী এবং রাসূলগণ, যারা সৃষ্টির সেরা। এটি হল শয়তানের সেই প্রতিবন্ধকতা যেখানে শয়তানের বাহিনী মু'মিন বান্দার উপর চড়াও হয় এবং বিভিন্ন প্রকারে তার ক্ষতিসাধন করেঃ হাত, জিহবা এবং অন্তর দ্বারা। ঈমানের মাত্রা অনুযায়ী এই পরীক্ষার মাত্রাও ভিন্ন হবে। বান্দার ঈমান যতবেশি হবে, শত্রু ততবেশি করে তার বাহিনীকে বান্দার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে। শয়তান তার অনুসারী ও মিত্রদের সহযোগিতায় বান্দাকে গুড়িয়ে দিতে চাইবে। এই বাধাকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই, কেননা আল্লাহর দিকে আহবানে সে যত দৃঢ়তার পরিচয় দেবে এবং আল্লাহর অর্পিত আদেশ পালনে ব্রতী হবে, শয়তান ততবেশি করে মূর্খলোকদের মাধ্যমে তাকে ধোঁকা দিতে তৎপর হবে। কাজেই, যে বান্দা তার শরীর ঈমানের বর্মে আচ্ছাদিত করে আল্লাহর রাহে, আল্লাহর নামে শত্রুকে মোকাবেলা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল, তার এই ইবাদাতই হল সকল ইবাদাতের মাঝে শ্রেষ্ট ইবাদাত'।

ইবনুল কায়্যিম রহ. এর এই কথাগুলো আদালতের সেই দৃশ্যে পরিষ্কারভাবে আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আদালতে আফিয়ার শরীরে দুর্বলতা আর নাজুকতার ভাব থাকলেও, সারাটা সময় জুড়ে আমি তার মধ্যে সুস্পষ্ট সম্মান ও শক্তির একটি ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। আদালতে তার সবকিছু, আইনজীবির মিথ্যা অভিযোগে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ; যে হিজাবের কথা এ ধরণের ভয়ানক পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ মানুষের মনেই থাকার কথা না, আদালতকক্ষে সে হিজাবে নিজেকে আবৃত রাখার প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগ; আদালত কক্ষে এফবিআই এজেন্ট, ইউএস মার্শাল, রিপোর্টার, অফিসিয়াল-সকলের এই নুয়ে-পড়া-দুর্বল-ছোটখাট-শান্তদর্শন এই মহিলার দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে থাকা এ সব কিছু একটা জিনিষ নির্দেশ করে, আর তা হল এদের সবাই আফিয়ার একটি জিনিষকে নিয়েই শঙ্কিত আর ভীতসন্ত্রস্ত, আর সেটি হল আমাদের এই বোনের ঈমান।

এই হল আমাদের প্রিয় বোনের অবস্থা, কুফফারদের হাতে বন্দি এক মুসলিম নারীর

কী বলার আছে আমার ?

মুসলিম বন্দী মুক্ত করার ওয়াজিব দায়িত্বের কথা বলে আমি আমার এ লেখা শেষ করব না। আমি খলিফা মু'তাসিমের উদাহারণ টেনে এনে বলব না দেখুন তিনি কেবল মুসলিম নারীকে উদ্ধার করার জন্য একটা শহর ধসিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সালাহ দ্বীন কিংবা উমর বিন আ'ব্দুল 'আযীয এর কথা আপনাদেরকে শোনাব না যারা কিনা হাজার হাজার মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার করেছিলেন। এ চমৎকার গল্পগুলো আপনাদের সামনে বলার লোভ আজকে আমাকে সংবরণ করতে হবে। কেন জানেন? কারণ, দুঃখের কথা এই নয় যে আফিয়া বন্দী। বরং দুঃখের কথা হল, পাঁচ লক্ষ মুসলিমের শহরে মাত্র অল্প কিছু মুসলিমও আফিয়ার শুনানির দিনে উপস্থিত থাকার কাজটাকে ঝামেলার ব্যাপার মনে করে নিজের গা বাঁচাতেই বেশি আগ্রহী। দুঃখ হল এই, পুরো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি মুসলিম সংগঠন এই বোনটির পক্ষে এগিয়ে আসল না, তার পক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। ইবনুল কায়্যিম রহ. ঠিকই বলেছিলেন,

'যদি গায়রত (উম্মাহকে আগলে রাখার প্রবল ঈর্ষা) মানুষের হৃদয় ত্যাগ করে চলে যায়, তবে সে হৃদয় থেকে ঈমানও হারিয়ে যায়।'

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন একটা সময়ে যখন আমাদের বেশিরভাগই দ্বীনুল আরবের অনুসারী হয়ে কেবল নামায-রোযা নিয়েই পড়ে আছে, তখন আফিয়া সিদ্দিক্বীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে, সে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারতেন একমাত্র আফিয়া নিজেই।



দেশ কোন দিকে যাচ্ছে?

আহমেদ রফিক

আজকাল যেখানেই যাই একটা কথা প্রায় সবখানেই শোনা যায়– ভাই দেশ কোন দিকে যাচ্ছে, কী হচ্ছে, কী হবে? এমন প্রশ্ন ক'বছর আগেও তেমন একটা শোনা যেত না। কারণ তখন পরিস্থিতি যতো ঘোলাটেই হোক না কেন, মানুষ দেশের শেষ গন্তব্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্বচ্ছ ধারণা রাখতো–হয় 'এ' দল নয়তো 'বি' দল। এর বাইরে যে কিছু হতে পারে এমন ধারণাই কারো ছিলো না। কিন্তু এখন মনে হয় সবাই এই ছকের বাইরে ভিন্ন কিছু একটা আঁচ করছে। হয়তো জানেনা তা কী–কিন্তু অন্য রকম কিছু যে হতে যাচ্ছে সেটা টের পাচ্ছে।

হ্যা, আমি কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক না হলেও, আম জনতার একজন হিসেবে আমারও তেমনই ধারণা। আমার এই ধারণার পেছনে কারণ হলো, একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কিছু চিহ্ন আছে। আমি সেই চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি। একই সাথে এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন কী ব্যবস্থা আসছে তা-ও কিছুটা বোধ হয় সচেতন সমাজ অনুমান করতে পারছে।

কোনো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পূর্বে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, আমার ধারণা তার সবই এখানে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে, হচ্ছে। মোটা দাগে তা কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. খোদ সেই ব্যবস্থার উপর থেকে গণমানুষের আস্থা উঠে যাওয়া।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে অনেক কারণ থাকলেও আমার মনে হয় প্রধানতম কারণ হলো, বাংলাদেশীদের উপর পাক শাসকদের নানা রকম বৈষম্যমূলক আচরণ। এ দৃষ্টিতে এ স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে এদেশীয় নেতাদের চেয়ে পাকিস্তানী মাথামোটা শাসক শ্রেণীই অধিক কৃতিত্বের দাবীদার। ভারতীয় প্রোপাগাণ্ডা আংশিক দায়ি হলেও মূলত তাদের অবিচার আর খামখেয়ালিপনার কারণেই এদেশের জনগণ তাদের উপর আস্থা হারিয়েছিলো। এ যুদ্ধের পেছনে প্রত্যক্ষ কোনো আদর্শিক কারণ ছিলো না। রুটিরুজি আর ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার নিশ্চিতকরণ ও বজায় রাখাই ছিলো মূল কারণ। যে দেশে নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে সেখানে ইদানিং হাইব্রীড ক্যালক্যাশিয়ান যোদ্ধাদের মুখে আমরা শুনতে পাই, 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই নাকি ছিলো এ যুদ্ধের মূল কারণ। আমি জানি না সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধারা আদৌ এই তত্ত্ব জানতেন কি না; কিংবা জানলে যুদ্ধ করতেন কি না। যাই হোক, তাদের সেই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার আসল-নকল, বানোয়াট-সত্যিকার সকল রূপই এই জাতি দেখেছে। একনায়কতান্ত্রিক গণতন্ত্র, আমলাতান্ত্রিক গণতন্ত্র, সামরিক উর্দির গণতন্ত্র, সামরিক ফ্লেভারের বেসামরিক গণতন্ত্র, পারিবারিক গণতন্ত্র–সব ফ্লেভারই জাতি চেখে দেখেছে এবং খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এ ব্যবস্থা কখনোই গণকল্যাণমুখী ছিলো না, নয় এবং কখনো হওয়া সম্ভব নয়। এটাও জনগণ বুঝে গেছে যে, এ ব্যবস্থায় তাদের অধিকার হলো কেবল কোন দল লুটপাট করবে– 'এ' দল, না 'বি' দল–তা নির্ধারণ করা।

সবচেয়ে বড় যে ফর্মুলাটি গণমানুষের সামনে ঝুলিয়ে রাখা ছিলো তা হলো 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। জনগণকে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে বুঝানো হচ্ছিলো যে, তারাই আসল শাসক। কারণ, তাদের ভোটেই শাসক নির্বাচিত হয় কিন্তু সেই আমজনতা যখন ভোট দিতে গিয়ে শুনলো যে 'চাচা/চাচি! আমরা থাকতে আপনাদের এতো কষ্ট কইরা ভোট দেওন লাগবো না, আঙ্গুলে কালি মাইখা বাড়িতে গিয়ে আরাম করেন'; যখন তারা দেখলো যে জনগণের ভোট ছাড়াও যথারীতি সরকার গঠন হয়ে গেলো, দেশও চললো, তখন ওসীমুদ্দিন কসীমুদ্দীনরাও বুঝে গেলো যে, তারা আসলে ক্ষমতার উৎস নয়; এটা নিছক একটা প্রতারণা। কিন্তু এখন দলীয় সুবিধাভোগী চামচা ছাড়া গণমানুষেরা আর এ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য মাঠে নামবে না। কারণ তারা বুঝে গেছে এটা আসলে তাদের ব্যবস্থা নয়।

২. ব্যবস্থার পরিচালকদের উপর থেকে আস্থা উঠে যাওয়া

Messenger is always equally important like the message itself. এমন কি 'কী' বলেছে আর 'কে' বলেছে এটা অনেক সময়ই অধিক গুরুত্ব বহন করে। এজন্য নবীদেরকে আল্লাহ জীবনের শুরু থেকেই বিশেষভাবে গড়ে তুলেছেন। যেকোনো আদর্শের প্রচারনার ক্ষেত্রে আদর্শ ও তার প্রচারক সমানুপাতিক গুরুত্ব রাখে। অনেক ক্ষেত্রে



আদর্শের প্রচারকদের নীতি-নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্ব অধিক গুরুত্ব বহন করে। এ কারণে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও আসমানী বাণী প্রচার শুরু করার পর নবীদের ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার হেন উপায় নেই যা কাফিররা অনুসরণ করেনি। অথচ এই বাণী প্রচার শুরুর আগে তাদেরকে তারা সমাজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করত। যে নবী মুহাম্মাদ সা. কে মক্কার কুরাইশরা 'আল আমীন' উপাধী দিয়েছিলো তাকেই তারা, মিথ্যাবাদী, যাদুকর, কবি, পাগল ইত্যকার নানা অপমানজনক অপবাদ দিয়েছে। তাদের প্রজাতীয় অপপ্রচারের মূল লক্ষ্য যতোটা না ব্যক্তি মুহাম্মাদ, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো তার প্রচারিত বাণী। তার উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিলো তার ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তার আনীত বাণীকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে গণতন্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। এদেশের যেসকল বড় বড় নেতাদের মাধ্যমে বড় কিছু হয়েছে তাদের সকলের উপরই গণমানুষের একটা আস্থা ছিল। তাদের আদর্শ সঠিক হোক বা ভুল সেটা ভিন্ন কথা; কিন্তু জনগণ বিশ্বাস করতো যে তারা সত্যিই গণমানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করতেন। তাদের জীবনধারা তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যেও ফুটে উঠতো। একারণে তাদের কথায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঠে নেমে আসতো গাটের পয়সা খরচ করে। তাদের জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করতে হতো না।

এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই, বর্তমানে দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের উপর থেকে গণমানুষের আস্থা উঠে গেছে। দলীয় সুবিধাভোগী চামচা, কিংবা পুর্বসূরী নেতাদের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা হেতু দলকানারা ব্যতীত আজকাল কেউই কোনো রাজনীতিককে নিস্বার্থ মনে করে না। যে বামরা গরীব-দুঃখীদের বন্ধু সেজে একটা মুখোশ অনেক কৌশলে ঝুলিয়ে রেখেছিলো তা-ও খসে পড়ে গেছে। লুটপাট আর চুরি-ডাকাতি নিয়ে এসব দলের মধ্য নীতিগত কোনো দ্বিমত নেই। মারামারি কেবল 'কে' করবে তা নিয়ে। আর একারণেই আমরা দেখেছি যে, এক দলের শাসকদের হাতে বিদেশি হানাদারদের মতো নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও, যুদ্ধের মতো এক দিনে শত শত মানুষ নিহত হওয়া সত্ত্বেও, অন্য দলের আহবানে সাধারণ জনগণ সরকার পতনের আন্দোলনে মাঠে নেমে আসেনি। কারণ তারা জানে যে, এখন এরা যতো নীতিকথাই কপচাকনা কেন; এরা বস্তুত সেই একই মুদ্রার ওপিঠ মাত্র। নিছক মুদ্রা উল্টানোর জন্য কখনো সাধারণ জনগণ মাঠে নামে না। মুদ্রা উল্টানোর জন্য মাঠে নামে কেবল অপরপিঠের সুবিধাভোগীরা। সাধারণ জনগণ তখনই মাঠে নামে যখন মুদ্রা পালটে দেওয়ার মতো আস্থা কারো উপর পায়।

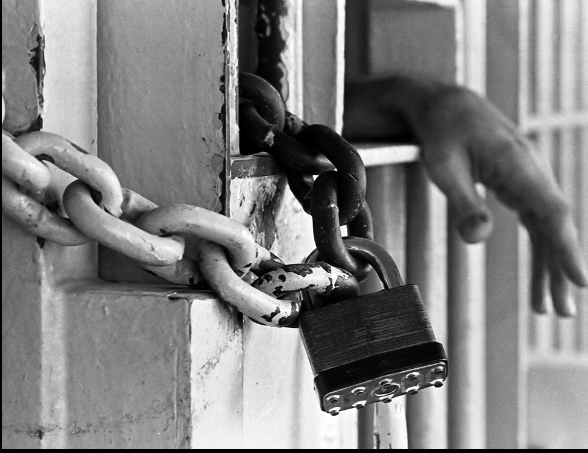
আপনি একজন কৃষক, দিনমজুর, কুলি, মুচি, নাপিত থেকে নিয়ে শুরু করে নিচু থেকে উঁচু, ছোট থেকে বড়, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত–যে কোনো শ্রেণী-পেশার মানুষকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন, রাজনীতিক কিংবা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাউকে এরা নূন্যতম বিশ্বাস করে কি না। এরা সব যে নিছক স্বার্থান্বেষী ধান্দাবাজ এ ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এরা যে মোটেই গণমানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করে না তা এরা সেভাবে জানে, যেভাবে নিজ হাতের পাঁচ আঙ্গুলকে তারা জানে। এদের কোনো গলাবাজি নীতিকথায় তারা বিশ্বাস করে না। কোনো ব্যবস্থার রক্ষকদের উপর থেকে আস্থা উঠে যাওয়া তার আশু পতন ছাড়া আর কিসের আলামত হতে পারে?

৩. নিজেকে নিরাপত্তাহীন ভাবা

সাধারণত নিরাপত্তাহীনতা দু' ধরণের। ১. চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী দুষ্কৃতিকারীদের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা। ২. রাষ্ট্রীয় যে বাহিনীর দায়িত্ব নিরাপত্তা দেওয়া, তাদের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা।

কোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন ও নতুন ব্যবস্থা আনয়নের জন্য রক্ত ও জীবন হলো আসল মূল্য। এ মূল্য পরিশোধ ছাড়া কখনো ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আদর্শের জন্য জীবনবাজী রেখে কাজ করে যাওয়া কিছু মানুষ সব সময় সব আদর্শেই কিছু না কিছু থাকে। কোথাও কম কোথাও বেশি। তবে সাধারণভাবে সব মানুষই নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ জীবন অধিক পছন্দ করে। এটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত, জীবন হারানো কিংবা জীবন হরণ কোনোটাই মানুষের পছন্দের কাজ নয়। কিন্তু এই নিরাপত্তা যদি তাদের হাতেই হারায় যারা নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত, তারা যদি চেকপোস্ট বসিয়ে দিনে দুপুরে মানুষ অপহরণ করে নিয়ে মেরে ফেলে, যেখানে সেখানে লাশ পড়তে থাকে, খালে-বিলে, নদি-নালায় ভেসে উঠতে থাকে, ঘর থেকে বের হতে যদি মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, অন্যায়ভাবে যদি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে তাদেরকে গুম-খুন, হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়- তখন তাদের ভাবনা পালটে যায়। এভাবে চলতে থাকলে এক পর্যায়ে তারা ভাবতে শুরু করে যে, 'আরে মরতে তো হচ্ছেই–তো কিছু করেই মরি'। তখন আদর্শবাদী মানুষের ক্ষুদ্র দল ভারী হতে থাকে। সাধারণ জনগণ এসে তাদের সাথে যোগ দেয় এবং তাদের সংস্পর্শে এসে তারাও আদর্শবাদী হয়ে ওঠে। জীবন বিলিয়ে দেয় পরিবর্তনের জন্য, সমাজখেকোদের হাত থেকে আপামর জনসাধারণকে রক্ষার জন্য।

এই পর্যায়টি যখন শুরু হয়ে যায় তখন পরিবর্তন আর কিছুতেই ঠেকানো যায় না; বন্দুকের নলের জোরে হয়তো কিছু দিন বিলম্বিত করা যায়। চারিদিকের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে দেশ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপে পা দিয়েছে। ভাবতে ভালোই লাগে। পরিবর্তন যেহেতু হবেই, হোক সে পরিবর্তন কল্যাণের, গণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার, মানবরচিত ব্যবস্থার জঞ্জাল থেকে মানুষের প্রভুর দেওয়া জীবনব্যবস্থার পথে এগিয়ে যাবার।



কারাগারের ভয় আমার নেই কিন্তু কবরে যাবার ইচ্ছাও আমার নেই

আবু হামজা

পুরান ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল ঘেঁষে বহুবার চলে গিয়েছি। কখনও বা চক বাজারের ঐতিহ্যবাহী জ্যামে আটকে থেকেছি আর উঁচু প্রাচীরের অন্যপাশের মানুষগুলোর জীবন নিয়ে কৌতুহল দেখিয়েছি। কিন্তু যখন আমি নিজে ঐ ভুবনের বাসিন্দা হয়েছি তখন সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করেছি কীভাবে একটা মানুষের জীবন একটা চার দেয়ালের মাঝে স্থির হয়ে যায়। কীভাবে সেকেন্ডের কাটা মিনিটে রূপান্তরিত হয় আর মিনিটের কাটা ঘন্টায়। কীভাবে একটা সামান্য দেয়াল মানুষকে তার এতদিনের ভোগ করা স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করায়। রিক্সার টুংটাং আওয়াজ আর বাদাম ওয়ালার "বাদাম বাদাম" হাকেও যে এতটা মধু আছে তা জেলখানার এই উঁচু দেয়ালই আমাকে প্রথম অনুভব করিয়েছে।

জীবনে বহুবার আমার পাশ দিয়ে প্রিজন ভ্যানকে যেতে দেখেছি এবং ভ্যানের ছোট জানালা দিয়ে উৎসুক চোখগুলো দেখে তাদের জন্য ইনসাফের দোয়া করেছি। কিন্তু আমি নিজে যখন ঐ ভ্যানের সাওয়ারি হয়েছি এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় এই রকম ঠাসাঠাসি ভিড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থেকেছি, মাঘ মাসের শৈতপ্রবাহের শীতেও দরদর করে ঘেমে শরীরের পোশাক চুবচুবা করে ভিজিয়েছি তখন সত্যিকারভাবে বুঝতে পেরেছি 'মানবাধিকার' একটি কাল্পনিক শব্দ মাত্র। একে শুধু অভিধান আর নেতানেত্রীদের ভাষণেই পাওয়া যায়। বাস্তবে এর কোনই অস্তিত্ব নেই। ভেবে বিস্মিত হয়েছি কেন আমাদের দেশে ২০ জনের ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিজন ভ্যানে ৫০ জনকে ঠেশে ঢুকানো হয় আর আমাদের তথাকথিত মানবধিকার কর্মীরা তা দেখেও না দেখার ভান করেন।

জেল কাউকে একদম ভেঙ্গে ফেলে আবার কাউকে আরো মজুবুত করে গড়ে তোলে। আলহামদুলিল্লাহ, জেল আমাকে ভাঙতে পারেনি বরং নতুন এক উদ্দম দান করেছে। এই জেলখানাই আমাকে সাইয়্যেদিনা ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্দীদশার অনুভূতি শিক্ষা দিয়েছে যা কোন কিতাব আমাকে কখনই দিতে পারেনি। এই জেলই আমাকে আমার বোন আফিয়া সিদ্দিকার কষ্ট যতটা হৃদয়ঙ্গম করিয়েছে তা কোন মিডিয়া কখনো পারে নি।

দীর্ঘ প্রায় এক বছর অন্যায় ভাবে কারাবন্দী জীবন কাটিয়েছি। মানুষ হিসেবে যখনই কিছুটা কষ্ট হয়েছে তখনই ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আফিয়া সিদ্দিকার ঘটনা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে নতুন শক্তি দিয়েছে। আমার সেলের একদিকের দেয়ালে বড় করে লিখে রেখেছিলাম,

These are the best days of my life

মানুষ অবাক হতো। কিন্তু আমাকে দেখে আমার লেখা বিশ্বাসও করতো। শুধু এই লেখাটা দেখার জন্যই অনেকে আমাদের তালিমের হালাকায় ভিড় জমাতো আর অদ্ভুত এক স্বপ্নদৃষ্টি প্রায় প্রতিটা দিন আমি মুক্ত আকাশে ভেসে বেড়ানো পাখিদের দিকে তাকিয়ে তাদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেছি আর গুনগুন করে তিলাওয়াত করেছি

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِير

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয় দেখেন। (সুরা মুলক : ১৯)

জেলের পুরো সময়টাই আমি দুটি পাখার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলাম। বার বার আল্লাহ তাআ'লার কাছে দোয়া করেছি যেন তিনি আমাকে তার দুশমনের শৃংখল থেকে নিরাপদ রাখেন কিন্তু তাদের বুলেট থেকে বঞ্চিত না করেন। এই দুনিয়াতে যেমন আছি ভালোই আছি কিন্তু জান্নাতে যেন তিনি দয়া করে আমাকে দুটি মস্তবড় পাখা দান করেন। আমি এই বেহায়া পাখিগুলোর ওপর কিছুটা প্রতিশোধ নিতে চাই।

আমি অনেক ভাইদের দেখেছি জেলের ভয়ে জড়সড়। এরা দুনিয়ার সামান্য আরাম আয়েশ হারানোর ভয়ে আর জেল হাজত এড়ানোর জন্য জেনে বুঝে আল্লাহ্ প্রদত্ত হক থেকে চোখ লুকিয়ে বেড়ায়। কেউ কেউ এমনকি আল্লাহর হুকুম লুকাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পর্যন্ত কিছু মাত্র দ্বিধা করছে না। ভাই একটু চোখ খুলে দেখুন। যে কারাগারকে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন তা আসলে কিছুই না। প্রকৃত ভয়ের জায়গা হচ্ছে কবর যা এড়ানোর কোন বেবস্থাই হয়ত আপনি নিচ্ছেন না।

জেল থেকে বেরুবার পর আমি যতবারই কবরস্থানের পাশ দিয়ে গিয়েছি ততবারই কবরের দিকে তাকিয়ে বলেছি, "হায় কবর! হায় কবর! নিশ্চয়ই তুমি অতি কঠিন ঠিকানা। বন্দীত্বের পূর্বে যেমন স্বাধীনতা কি জিনিস আমি বুঝিনি, মৃত্যুর পূর্বেও তেমনি হায়াতের মর্মও বুঝতে পারছি না। কারাগারের ভয় আমার নেই কিন্তু কবরে যাবার ইচ্ছাও আমার নেই।"

ইয়া আল্লাহ্! ইয়া মাবুদ! আমি মৃত্যু চাই না, হায়াত চাই। কবর চাই না সবুজ পাখির সিনা চাই। এক জোড়া পাখা চাই। আপনার রেদা (সন্তুষ্টি) চাই আর দ্বিদার চাই। আপনি আমাকে মৃত্যু থেকে হেফাজত করুন। কবর থেকে দূরে রাখুন। একটা বুলেট আমার জন্য মঞ্জুর করুন যা আমার সিনাকে ভেদ করে যাবে। আমাকে শাহাদাত দান করুন। আমাকে কবুল করুন।

আমিন, ইয়া রব্বুল আলামিন।

ওয়াসসালাম

$1,589,776,591,407

ইরাক আফগান যুদ্ধে আমেরিকার প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

হাসান ইমতিয়াজ

আঠারো শতাব্দীতে 'টমাস ক্যান' নামে একজন প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ছিলেন। খ্যাতনামা পশ্চিমা সাহিত্যিকদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হত। তিনি একবার আমেরিকার ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, শক্তিমানদের ক্ষমতার দাপট ততদিন থাকে যতদিন তারা দুর্বলদের নিগ্রহের মত ভুল পন্থা অবলম্বন করে। তার মন্তব্যের পর্যালোচনায় না গিয়েও যদি ইতিহাসের দিকে তাকানো হয় তাহলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অমুসলিম বড় বড় শক্তিগুলোর পতন তখনই তরান্বিত হয়েছে যখন তারা জুলুম নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। আর এসব বৃহৎ শক্তিগুলোর পতন ঐসব মানুষের হাতেই হয়েছে যাদেরকে দুর্বল ভাবা হয়। ইসলামের সূচনাকালের অসম যুদ্ধগুলোতে তখনকার পরাশক্তিগুলোর লজ্জাজনক পরাজয় এবং পরেরদিকের ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলোতে স্বৈরাচার শক্তিগুলোর একের পর এক পরাজয়বরণ এর জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। ইতিহাসের সে সূত্র ধরেই বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিবর্তিত মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে ইরাক আফগানিস্তানে নিরীহ মানুষের উপর হামলা, সেনা-সমাবেশ ঘটিয়ে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমেরিকা ও পশ্চিমাবিশ্ব পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আমেরিকা নিজেদের সামরিক শক্তি ও সমরাস্ত্র নিয়ে অহংকার করে। নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। তবে তাদের এ দুটি গর্বের বস্তু যখন সংকটাপন্ন হবে তখন তাদের পরাজয় অবধারিত হয়ে পড়বে। এটা স্পষ্ট।

আসুন দেখা যাক বিগত তের বছরের ইরাক-আফগানিস্তান যুদ্ধে আমেরিকার প্রকৃত ক্ষয় ক্ষতির পরিসংখ্যান, যা তাদের স্বীকরোক্তি থেকেই বেরিয়ে এসেছে।

২০০১ এর ১৭ অক্টোবর আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব কুফরীশক্তি আফগানিস্তান আক্রমণ করে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত বিশাল সৈন্য বহর নিয়ে। যারা সার্বক্ষণিক বিপুল অর্থনৈতিক সাপোর্ট পাচ্ছিল। উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক অপ্রতিরোধ্য বাহিনীই মনে করা হত তাদের। এক রকম নিশ্চিতই ছিল যে, সামান্য সময়ের ঝটিকা অভিযানেই তালেবানের যুদ্ধের স্বাধ মিটে যাবে। তাদের নাম নিশানা চিরতরে মুছে যাবে। যুদ্ধের ব্যয়ও সামান্যই হবে। তখন পশ্চিমা বিশ্লেষকদের বিশ্লেষণ ছিল 'যদি যুদ্ধ দীর্ঘ হয় তাহলে আমেরিকার পরাজয় নিশ্চিত। কারণ এর ফলে আমেরিকার সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণে বেড়ে যাবে, যা এক সময় চূড়ান্ত পরাজয়ে সমাপ্ত হবে।

এখন আমেরিকা বুঝতে পারছে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। কারণ, দিন কয়েকের অভিযান ভেবে উদ্যমতার সাথে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা এক দীর্ঘমেয়াদী মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। সে ফাঁদে তাদের হাজার হাজার সেনা খোয়া গেছে। আহত হয়ে রাষ্ট্রের বোঝা হয়েছে আরো বেশি। আর অর্থনৈতিকভাবে ঋণের ভারে হয়েছে নুজ্য। আমেরিকার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দু'ধরণের জরিপ হয়েছে। একটি সরকারী ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আরেকটি জরিপ ঐসব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠেনের পক্ষ থেকে যারা নানা কারণে এ আগ্রাসনের বিরোধিতা করে আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল উভয় পরিসংখ্যানের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, পেন্টাগনের রিপোর্ট বলছে ইরাক-আফগানিস্তানে আমেরিকার এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৬ শত ৯৮ জন সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে। অন্যদিকে অবসর প্রাপ্ত আমেরিকান সেনা কর্মকর্তাদের আধাসরকারী সংগঠন মৃতের সংখ্যা ৭৮ হজার ৬০০ বলে দাবী করেছে। এমনিভাবে আহত সৈন্যদের সংখ্যা পেন্টাগন বলছে, ৪১ হাজার ৩০। কিন্তু 'এন্টিওয়ার' নামক একটি সংগঠন তাদের ওয়েবসাইটে এ সংখ্যা ১ লক্ষ দাবী করেছে। তবে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের সংগঠন ইরাক আফগান যুদ্ধে আমেরিকান আহত সৈন্যদের সংখ্যা ৬ লক্ষ বলে দাবী করেছে। তাদের যুক্তি, আমেরিকান সামরিক নিয়ম অনুসারে যে সব যুদ্ধাহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য আমেরিকা আনা হচ্ছে তাদের জন্য বরাদ্ধ এতই বেড়ে গেছে যে, এর ফলে অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের ভাতার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছে মারাত্মকভাবে। তারা বলেছে, এখন পর্যন্ত ৬ লক্ষ আহত সৈন্যের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। যাদের যুদ্ধ চলাকালীন চিকিৎসা দেয়া হয়েছে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

কংগ্রেস যুদ্ধের মোট ব্যয়ের পরিমাণ অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। সিভিল প্রশাসন ও সৈন্যদের ব্যয়ের পরিমাণ যাচাই করে দেখা যাদের দায়িত্ব। বলা হয়, সংগঠনটি এ কাজে ছাড় দিতে নারাজ। এমনকি তারা পুরো আমেরিকান প্রশাসন অর্থাৎ, রাষ্ট্র ও জনগনের আমদানী রপ্তানী সার্বক্ষণিক তদারকি করে থাকে। এ সংগঠনটি তাদের এক রিপোর্টে বলেছে, ২০০১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমেরিকান সরকার প্রতি ঘন্টায় ১০ দশমিক ৫৪ হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। যার মধ্যে ৮০ ভাগই ব্যয় হচ্ছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

বিগত চৌদ্দ বছরে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এ খাতে তা ইতিহাসের সবচে' বড় ব্যয় এত সন্দেহ নেই। ৯/১১ এর পর থেকে ২০১০ পর্যন্ত ইরাক আফগানিস্তান যুদ্ধের জন্য যে বাজেট অনুমোদিত হয়েছে তার পরিমাণ ৩ হাজার ট্রিলিয়ন ২৯১ বিলিয়ন ডলার। ফ্রান্সের 'লুফিগার্ড' নামে একটি পত্রিকা এ পরিসংখ্যানটি সত্যায়ন করেছে। ফ্রান্সের এ ম্যাগাজিনটি ১৪ অক্টোবর ২০০৮ সালে 'যুদ্ধ ব্যয়' শিরোনামে একটি বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল। যাতে যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দিকে আরব নিউজ নামক একটি অনলাইন ম্যাগাজিনের অনুসন্ধান বিভাগের মহাপরিচালক আব্দুল মুনিম তার গবেষণা প্রতিবেদনে আমেরিকার প্রচার মাধ্যমের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, আফগানিস্তান ও ইরাকে এ পর্যন্ত আমেরিকার ছয় লক্ষ যুদ্ধ সরাঞ্জাম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। আহত নিহত ও যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত সৈন্যের সখ্যা ১০ লক্ষের বেশি। 'আলকিফাহ' নামে একটি আরবী সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ইরাক আফগানিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। যাতে কংগ্রেসের একজন দায়িত্বশীল মেম্বার জেমস্ মিক গ্যাফরনের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে –ইরাক আফগানিস্তানে গড়ে দৈনিক ২৪৬ মিলিয়ন ডলার আমেরিকার গচ্চা দিতে হচ্ছে। এ রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে, যেসকল আমেরিকান সেনা, কর্মচারী ও পর্যটক প্রাণ হারিয়েছে তাদের সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক। স্বর্তব্য যে, এ রিপের্টটি ২০০৭ সালের।

আমেরিকার সরকারী ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আমেরিকার উপর আবশ্যক ঋণের পরমাণ ছিল ১৬ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে ১৭শ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। রাষ্ট্রীয় ট্রেজারী দৈনিক ২ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার লোকসান টানছে। ২০০৮ সাল থেকে ৭ মিলিয়ন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বন্ধ রয়েছে। শোনা যাচ্ছে আমেরিকা এখন প্রতি মাসে ৪৬ বিলিয়ন ডলার কাগজের নোট ছাপাচ্ছে। যা অর্থনীতিতে দারুণ প্রভাব ফেলছে।

নিকট ভবিষ্যতে আমেরিকাকে যে সব দেশের ঋণ পরিশোধ করতে হবে তা হল, জাপান ৫৪৬ বিলিয়ন ডলার। চীন ৪০০ বিলিয়ন ডলার। ব্রিটেন ২৪৪ বিলিয়ন ডলার। সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশ ১২৩ বিলিয়ন ডলার।

খোদ আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের এক অনুসন্ধান–প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে যেমন আমেরিকান সৈন্য হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়, অর্থাৎ, তাদের পেন্টাগনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পরিসংখানের উপর আস্থা নেই। অন্য দিকে এ যুদ্ধে আমেরিকার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে। অনুসন্ধান রিপোর্টের সদস্য সিনেটর 'বব চর্কার' -যিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন নেতা- তিনি লিখেছেন, আল কায়েদার ১৯ সদস্য চার-পাঁচ লাখ ডলার খরচ করে নাইন ইলেভেন ট্র্যাজেডির জন্ম দিয়েছিল। যাতে প্রাণ হারিয়েছে ৩ হাজার মানুষ। সম্পদহানি হয়েছে ৭০০ থেকে ১০০০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ ঘটনার পর আমেরিকা যখন ইরাক ও আফগানিস্তান হামলা করল তখন এ ক্ষতির পরিমাণ চারগুণ বেড়ে গেছে।

আমেরিকার আরেকটি সংগঠন ক্ষয় ক্ষতির পরিসংখ্যান এভাবে করেছে:

Cost of Military Action Aganist ISIS
Evry hour, tarxpayers in the United States are paying $312,500 for cost of Military Aganist ISIS.
$1,468,258,411

Cost of War in Afganistan
Evry hour, taxpayers in the United States are paying $10.17 million for cost of War in Afganistan.
$771,354,515,671

প্রতি ঘন্টায় আমেরিকান সরকার জনগনের ট্যাক্সের টাকা থেকে যুদ্ধে কী পরিমাণ ব্যায় করে ভেবে দেখুন।

Cost of War in Iraq
Evry hour, taxpayers in the United States are paying $365,297 for cost of War in Iraq
$818,521,924,758

Total cost of Wars Since 2001
Evry hour, taxpayers in the United States are paying $10.54 million for Total cost of Wars Since 2001
$1,589,776,591,407

সার কথা, আমেরিকার এ অন্যায় যুদ্ধে যা অর্জন হয়েছে তা হল-

১. ১১- সেপ্টেম্বর হামলায় ৩ হাজার মানুষের মৃত্যু এবং ১০ হাজার বিলিয়ন ডলার সম পরিমাণ সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি।
২. ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত আফগানিস্তান ও ইরাকে ১০ লক্ষ সৈন্য আহত- নিহত পঙ্গু হয়েছে।
৩. এ পর্যন্ত আমেরিকার
৬ লক্ষ সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস হয়েছে।
৪. সামরিক ব্যয় ৩ হাজার ২৯১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
৫. আমেরিকার বৈদেশিক ঋণ ৭০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।
৬. ২০০৮ সাল থকে ৭০ লাখ কর্মচারির বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
৭. দিন দিন ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলছে।

অবশেষে দেখা যাবে নির্মম পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে আমেরিকা পালাতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বের নিপীড়িত জনতা যমানার ফেরাউনদের শেষ-কৃত্য দেখার অপেক্ষায় রইল।

পারস্যের এক সত্যসন্ধানী যুবকের গল্প

নাজমুস সাকিব

পারস্যের এক নওজোয়ান। অগ্নিপূজারক বাবার বিরাট ভূ সম্পত্তি। প্রভাব প্রতিপত্তি, ধর্মীয় নেতৃত্ব, সব দিকেই প্রথম কাতারে থাকা বাবার ছেলে মানেই তো অন্যকিছু! বাবার ছায়া ধরে হাঁটি হাঁটি করে ছেলেও পেল ধর্মীয় পুরোহিতের একটা পদ। বাবার আদেশে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে একেবারে এক পায়ে খাড়া ছিল সে। ছেলের হাতে দায়িত্ব দিয়ে বাবাও মন দিলেন খামারের কাজে।

একদিন বাবার খামারে যাওয়া হল না। কি মনে করে ছেলেকে বললেন যেতে। আজ না হয় খামারেই যাক সে। পিতার একান্ত বাধ্য ছেলেও পথ ধরলো খামারের।

চলতে চলতে পথেই পড়ে এক গির্জা। গির্জা থেকে তখন ভেসে আসছিল খ্রিষ্টানদের প্রার্থনার শব্দ। সে কখনো গির্জার ইবাদত দেখেনি। কৌতুহলী সে ফারসি যুবক কি মনে করে ঢুকে পড়লেন গির্জায়। মুগ্ধ হয়ে দেখলেন তাদের প্রার্থনা। মনে মনে বলতে লাগলো, 'আমরা যে ধর্মের অনুসারী, তা থেকে এ ধর্ম অতি উত্তম।'

খামার গেল গোল্লায়, নওজোয়ান সেই গির্জায় সারাটাদিন কাটিয়ে দিল! এর মধ্যেই জানতে পারলো এই ধর্মের উৎস নাকি শামে।

এদিকে সন্ধ্যার পরে ঘরে ফিরে এসে যখন তার বাবাকে সব খুলে বলল, বাবা তো রেগেমেগে অগ্নিশর্মা!

'বেটা! ঐ ধর্মে কল্যাণ নেই! তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম তার চাইতে উত্তম।'

ছেলের আসন্ন ধর্মত্যাগের শঙ্কায় ভীত বাবা বুঝি কেঁপে কেঁপে উঠলেন। ছেলের ভয়াবহ বিপদ টের পেয়ে তার পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে বেঁধে রাখলেন।

এদিকে ছেলেও অস্থির হয়ে পড়লো। কিছু একটা বোধহয় ঠিক হচ্ছেনা। এ কোন ধর্ম পালন করছে সে? অস্থির যুবক অবশেষে কোনরকমে গির্জায় সংবাদ পাঠালো যে, শাম অভিমুখে কোন কাফেলা গেলে তাকে যেন জানানো হয়। কপাল ভালো, মিলেও গেল একটা কাফেলা। সুযোগ আর ছাড়লো না সে।

পিতৃপুরুষের ধর্ম, আচার, সংস্কৃতি সব পেছনে ফেলে সেই ফারসি নওজোয়ান পালিয়ে গেল। কাফেলার সাথে নওজোয়ানও গিয়ে পৌঁছালো শামে। সময় নষ্ট করার মানুষ না সে। গিয়েই খবর নিলো এ ধর্মের সবচে জ্ঞানী ব্যক্তিকে। সবাই বললো বিশপ, গির্জার পুরোহিত।

যুবকটি খুঁজে ঠিকই বের করে ফেলল বিশপকে। গিয়ে বলল, 'আমি খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার ইচ্ছা, আপনার সাহচর্যে থেকে আপনার সেবা করবো। আপনার নিকট থেকে শিক্ষালাভ করবো ও আপনার সাথে প্রার্থনা করবো।' বিশপ তাকে গ্রহণ করলেন। যুবক সোৎসাহে বিশপের সেবা করতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই একটা কঠিন ধাক্কা খেলো সে। এ বিশপ যে আগাগোড়াই অসৎ! বিশপ সবাইকে বয়ান করে বেড়ায় তোমরা দান খয়রাত কর, আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। অথচ কেউ যখন আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্যে কিছু তার হাতে তুলে দেয়, সে তা আত্মসাৎ করে বসে। যুবক দেখলো এভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় সাত কলসি স্বর্ণ জমিয়ে ফেলেছে বিশপ! এমন ধর্মগুরুর প্রতি এক রাশ ঘৃণা নিয়ে যুবক দিনানিপাত করতে লাগলো। হঠাৎই একদিন মারা গেল সে। খ্রিষ্টানরা তাকে কবর দিতে এলে যুবক খুলে দেয় তার সমস্ত কুকীর্তির ভান্ডার। সত্য উন্মোচিত হলে সবাই বলে, 'আমরা একে দাফন করবোনা।'

অতঃপর সবাই তখন নতুন আরেক জনকে বিশপের স্থান দিল। এই বিশপ ছিলেন চরিত্রের দিক থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থানকারী। যুবক তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। সেই পাদ্রীর মৃত্যুর মুহূর্তে যুবক তাকে জিজ্ঞাসা করলো,'জনাব, আপনার মৃত্যুর পর আমাকে কার সাহচর্যে কাটাবার উপদেশ দেবেন?'

তিনি বললেন, 'যে সত্য আমি আঁকড়ে ধরেছি, তার ধারক আর কেউ আছে বলে আমি জানিনা। তবে 'মসুলে' এক ব্যক্তি আছেন,তার নাম অমুক, তিনি এ সত্যের এক বিন্দুও পরিবর্তন করেন নি। তুমি তার সাহচর্য গ্রহণ কর।'

পাদ্রীর মৃত্যুর পর যুবক আবার নেমে পড়ে তার সত্য সন্ধানী যাত্রায়। মাওসেলে গিয়ে খুঁজে বের করে সেই উস্তাদকে। তাকে সব খুলে বলে। উস্তাদ তাকে তার সাথেই রেখে দিলেন।

তবে আল্লাহর ইচ্ছে ছিল তাকে আরো পরীক্ষা করবেন। সেই উস্তাদও মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় তার শিয়রে বসে যুবক সেই একই প্রশ্ন করলো,'আপনার মৃত্যুর পর আমাকে কার সাহচর্যে কাটাবার উপদেশ দেবেন?'

উস্তাদ জবাব দিলেন, 'নাস্সিবীনে' অমুক নামে একজন ব্যক্তি আছেন। তুমি তার সাথে মিলতে পারো।'

যুবক আবার নেমে পড়লো নাস্সিবীনের উদ্দেশ্যে। কাঙ্ক্ষিত উস্তাদের দেখা পেয়ে তাকে সমস্ত কিছু খুলে বলল। তিনি যুবককে তার কাছে রেখে দিলেন।

অদ্ভুত জীবন ছিল যুবকের। অদ্ভুত ছিল তার তাকদীর। সে পাদ্রীর মৃত্যুর সময়ে সেই একই প্রশ্ন আবার করলো যুবক,

'আপনার মৃত্যুর পর আমাকে কার সাহচর্যে কাটাবার উপদেশ দেবেন?'

উস্তাদ উত্তর দিলেন,'আম্মুরিয়াতে' একলোক আছেন। তুমি তার কাছে যাও।'

যুবক আবার এগিয়ে চললো আম্মুরিয়াতের উদ্দেশ্যে। খুঁজে পেলো সেই ব্যক্তিকে। খুলে বলল সমস্ত কাহিনী। তিনি তাকে নিজের কাছে রাখলেন।তবে আল্লাহর যেন ইচ্ছেই ছিল এই যুবকের জীবনটা আরো অভিযাত্রাময় করে তুলবেন। তার এই উস্তাদও মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে যখন যুবক তাকে তার পরবর্তী উস্তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তিনি বলেন,

'বৎস! আমরা যে সত্যকে ধরে রেখেছিলাম, সে সত্যের উপর ভূপৃষ্ঠে অন্য কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট আছে বলে আমার জানা নেই। তবে অদূর ভবিষ্যতে আরব দেশে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি ইব্রাহীমের দ্বীন নতুনভাবে নিয়ে আসবেন। তিনি তার জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বড় বড় কালো পাথরের জমিনের মাঝখানে খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন থাকবে তাঁর। তিনি হাদিয়ার জিনিস খাবেন, কিন্তু সাদকার জিনিস খাবেন না। তাঁর দু কাঁধের মাঝখানে নবুয়্যাতের মোহর থাকবে। তুমি পারলে সে দেশে যাও।'

সালমান নামের সেই সত্যসন্ধানী ফারসি যুবক যেন তাঁর জীবনের অন্যতম কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। কারো কাছে যাওয়ার নেই। কারো কাছে ধর্ম শিক্ষা করার সুযোগ নেই। আপন বলে কেউ নেই। সাথে তার শুধুমাত্র উস্তাদের এক ভবিষ্যৎ বাণী আর তার উপর অগাধ বিশ্বাস। যুবক নতুন করে উঠে দাঁড়ালেন।

শুরু হল তার রোমাঞ্চকর এক যাত্রা।কোন উস্তাদ নেই। কোন পথপ্রদর্শক নেই। কোন শিক্ষক নেই।

সত্যানুসন্ধানে অদম্য পারস্য যুবক সালমান রাযি. কিছুটা থমকে গেলেন। বেশ কিছুটা দিন একা একাই কাটিয়ে দিলেন আম্মুরিয়াতে। কিছুদিন পরেই সেখানে কিছু আরব ব্যবসায়ী এল। সালমান রাযি. দেখলেন এই তো সুযোগ আরব দেশে যাওয়ার! তিনি ব্যবসায়ীদের দিলেন এক লোভনীয় প্রস্তাব।

'আপনারা যদি আমাকে সঙ্গে করে আরব দেশে নিয়ে যান, বিনিময়ে আমি আপনাদের আমার এই গরুগুলো আর এ ভেড়াটা আপনাদের দিয়ে দেব।'

আরবরা এ প্রস্তাব লুফে নিল। ফলে আরবদের সাথে আরব দেশের উদ্দ্যেশ্যে রওনা হলেন সালমান রাযি.। কিন্তু সালমান রাযি. কি জানতেন কী অপেক্ষা করছে তার জন্যে?

মদীনা আর শাম- এই দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি 'ওয়াদি আল কুরা' নামক স্থানে যখন কাফেলাটি পৌঁছালো, ব্যবসায়ীরা সালমানকে রাযি. এক ইহুদীর কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিল! চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে সালমান রাযি. সেই ইহুদীর দাস হয়ে গেলেন।

তারপরেও সালমান রাযি. তার দাসত্ব মেনে নেন। মেনে নেন বাস্তবতাকে। এরই মাঝে ঘটে আরেক ঘটনা। সেই ইহুদী মালিকের এক চাচাতো ভাই এসে একদিন সালমানকে রাযি. কিনে নেন। শাপে বর যেমন হয়, সালমানের রাযি. এর জন্যেও তেমনই হল। নতুন মালিক তাকে নিয়ে পথ ধরলেন মাদীনা মুনাওয়ারার!

মদীনা পৌঁছেই যেন সালমানের রাযি. কাছে দিবালোকের মত সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এ যে সেই শহর!

'আল্লাহর কসম! আমি যখন এই শহর দেখি, আমি তখনই বুঝে যাই এটাই সেই জায়গা যার কথা আমার উস্তাদ আমাকে বলেছিলেন!'

সময় বয়ে যায়। সালমান রাযি. সেই ইহুদীর দাস হিসবে কাজ করতে লাগলেন। আর অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই রাসূলের, যিনি ইব্রাহীমের দ্বীন নিয়ে হাজির হবেন। একদিন সালমান রাযি. খেজুর গাছে উঠে কি যেন করছিলেন। তার মালিক গাছের নিচে বসে ছিল। এমন সময় তার এক চাচাতো ভাই এসে বলল,

'বানী কীইলা ধ্বংস হোক। তারা কিবা (মদীনা) তে এক লোকের চারপাশে সমবেত হয়েছে, যে কিনা মক্কা থেকে এসে দাবি করছে সে আল্লাহর রাসূল!'

সালমানের রাযি. কানে এই কথা যেতেই তিনি রীতিমত কাঁপতে শুরু করলেন। লাফ দিয়ে নেমে এসে তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন

'কি বললে তুমি? কী বললে?'

এ কথা শুনতেই তার মনিব রাগে ফেটে পড়লো আর ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল সালমানের রাযি. গালে।

'এর সাথে তোমার সম্পর্ক কি? যাও কাজে যাও!'

সালমান রাযি. দমলেন না। কিছু খেজুর জমা ছিল তার। সেগুলো নিয়ে সেদিন সন্ধ্যাতেই তিনি রাসূল সা. এর কাছে গেলেন। কিছু খেজুর তাকে দিতে গিয়ে বললেন,

'আমি শুনেছি আপনি একজন পূণ্যবান ব্যক্তি। এ সামান্য কিছু জিনিস আমি সদকার উদ্দেশ্যে জমা রেখেছিলাম। আমি দেখছি অন্যদের তুলনায় আপনারাই (রাসূল ও তার সাহাবীগণ) এর অধিক যোগ্য।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সালমান রাযি. যা লক্ষ্য করলেন, তাতে তার বিস্মিত হবার পালা। রাসূল সা. খেজুরগুলো সাহাবীদের খেতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু নিজে ধরেও দেখলেন না। সালমানের রাযি. মনে মনে ভাবছেন- প্রথম ইঙ্গিত পেয়ে গেছি! উস্তাদ বলেছিলেন,

'তিনি হাদিয়ার জিনিস খাবেন, কিন্তু সদকার জিনিস খাবেন না।'

সালমান রাযি. ফিরে এলেন। এবার আরো কিছু খেজুর জোগাড় করলেন। কিছুদিন পর আবার গেলেন রাসূল সা. এর কাছে। খেজুর এগিয়ে দিয়ে বললেন-

'আমি দেখলাম আপনি সদকার জিনিস খান না। তাই এবার কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি আপনাকে দেয়ার উদ্দেশ্যে।'

এবার তিনি নিজেও খেলেন, সাহাবীদেরকেও খেতে নির্দেশ দিলেন। সালমান রা. এবার আরো খুশি হলেন। কারণ দ্বিতীয় নিদর্শনটিও যে মিলে গেলো।

রাসূল সা. এবার তা নিজেও খেলেন, সাহাবীদেরও খেতে নির্দেশ দিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। একদিন রাসূল সা. তাঁর এক মৃত সাহাবীকে দাফন করছিলেন। তার পরনে ছিল একটা ঢিলেঢালা পোষাক। সালমান রাযি. এসে তাকে সালাম দিলেন। এবার সালমান রাযি. শেষ নিদর্শন খুঁজতে লাগলেন।

'তাঁর দু কাঁধের মাঝখানে নবুয়্যাতের মোহর থাকবে'

সালমান রাযি. বার বার রাসূলাল্লাহ সা. এর পেছনে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলেন। উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলেন। একটাবার যদি দেখা যায়! কিভাবে যে দেখা যায়!

এদিকে রসূল সা. সালমানের কণ্ড দেখছিলেন। তিনি নিজেই ইচ্ছে করে তার চাদরটি পেছন দিক থেকে কিছুটা নামিয়ে দিলেন। এ ছিলো এক অদ্ভুত ও চমকপ্রদ ঘটনা। রাসূল সা. এর দুই কাধের সামান্য নিচে বিদ্যমান নবুওতের মোহর দেখতে পেলেন।

সালমান রাযি. আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। এত বছরের সাধনা, এত কষ্ট, এত যন্ত্রনা, নিজের সাথে, নিজের কওমের সাথে এত যুদ্ধ, এতটা পথ যাত্রা, এত অপেক্ষার পর যখন চোখের সামনে আল্লাহর একজন সত্য নবী দন্ডায়মান থাকেন, তখন নিজের আবেগকে ধরে রাখা কোন মানুষের পক্ষেই হয়তো সম্ভব ছিল না। সালমান রাযি. নবুয়াতের সেই মোহরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আর চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলেন। দু চোখে তার অঝোর ধারায় পানি ঝরছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এক আবেগময় দৃশ্য। যা কখনই কেউ দেখেনি। যারা সালমানকে রাযি. চেনেনা, তারা কখনই বুঝতে পারবেনা এই আবেগের পেছনে কী লুকিয়ে আছে।

এবার রসূল (সা) তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং তার কাহিনী জানতে চাইলেন, সালমান রাযি. তার সমস্ত কাহিনী খুলে বললেন। সেই গির্জা থেকে শুরু করে তার দাসত্বের জীবন পর্যন্ত। এযে তাওহীদের সন্ধানে বিস্ময়কর এক যাত্রার গল্প। রাসূল সা. তাকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি নিজ মুখেই সবাইকে এই গল্প শোনান। সালমানও রাযি. সব সাহাবীকে তার গল্প শোনালেন। এ যে রূপকথাকেও হার মানায়!

কিন্তু একটা ঝামেলা তখনও ছিল। সালমান রাযি. তখনও সেই ইহুদীর দাস। রাসূল সা. তাকে তার মনিবের সাথে একটা মুক্তি চুক্তি করার পরামর্শ দিলেন। সালমান রাযি. চুক্তি করলেন। চুক্তি মতে সালমান মনিবকে ৪০ আউন্স স্বর্ণ দেবেন আর ৩০০ খেজুরের চারা লাগিয়ে দেবেন ও তার দেখাশোনা করে দেবেন।

সালমান রাযি. রাসূলুল্লাহ সা. কে এই চুক্তির কথা বললে তিনি সাহাবীদেরকে ডেকে বলেন,'তোমরা তোমাদের এ ভাইকে সাহায্য কর।'

সবাই পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ করে যে যা পারলেন খেজুরের চারা দিলেন। অবশেষে তার ৩০০ চারা যোগাড় হয়ে গেল। এরপর তিনি রাসূল সা. নির্দেশমত গর্ত করলেন। রাসূল সা. নিজে তার সাথে গিয়ে সেখানে নিজ হাতে চারা রোপণ করলেন। চারাগুলো বেড়ে উঠলো।

কিন্তু তখন স্বর্ণ পরিশোধ করা বাকি। চিন্তিত সালমান রাযি. একদিন দেখলেন রাসূল সা. তার জন্যে মুরগীর ডিমের মত একটা স্বর্ণজাতীয় জিনিস নিয়ে এসে ধরিয়ে দিয়ে বললেন,'যাও। তোমার চুক্তি মোতাবেক পরিশোধ কর।'সালমান রাযি. বললেন,'এতে কি তা পরিশোধ হবে?'রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'ধর। আল্লাহ এতেই পরিশোধ করবেন।'সালমান রাযি. যখন তার এই গল্প বলছিলেন তখন বললেন,'আল্লাহর কসম! ওজন করে দেখলাম তাতে ৪০ আউন্সই ছিল!'অবশেষে চুক্তি পূর্ণ করে সালমান রাযি. মুক্তি লাভ করলেন। অন্যান্য মুহাজির সাহাবিদের মত সালমানকেও রাযি. রাসূল সা. একজন আনসার সাহাবীর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তার ভাই ছিলেন আবু দারদা রাযি.।

এই ছিল সালমান রাযি. গল্প। সালমান আল ফারিসির রাযি. গল্প। যে বিস্ময়কর অভাবনীয় অভিযাত্রার গল্প সালমান আল ফারিসি রাযি. নিজের মুখেই ইবন আব্বাসকে রাযি. বর্ণনা করেছিলেন। সে এক বিখ্যাত হাদীস।

তাওহীদের পথে, আল্লাহর ইবাদতের পথে, সত্যের পথে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃসহ অভিযাত্রার এক অনবদ্য মহাকাব্য রচনা করেছিলেন সালমান আল ফারিসি রাযি.। তার এই 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' সদৃশ অভিযাত্রা যুগে যুগে, কালে কালে প্রেরণা যুগিয়েছে সত্য সন্ধানী মানুষদের। সত্যের পথে অবিচল থাকা আর জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় তিনি নেমেছিলেন, তা আমাদের সকলকেই নতুন করে ভাবতে শেখায় যে, ইসলাম কোন Taken for granted জীবন বিধান নয়। মুসলিম হতে পারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফ্রী সার্ভিস নয়। এটা অর্জন করতে হয়। ইসলামকে অনুসন্ধান করতে হয়। ইসলামকে চেতনায় ধারণ করতে হয়। তবেই না আমরা মুসলিম।

সালমান আল ফারিসির রাযি. ইসলামের পথে আসার যে মোহনীয় অভিযাত্রার বর্ণনা আমরা পড়েছি, তাতে শুধু অবাক হলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়না। এই বিস্ময়কয় অভিযাত্রা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন। এটা এমন এক যাত্রা, যা থেকে সত্য অনুসন্ধান করার যে চেতনা আমাদের লালন করা উচিৎ, তার একটা স্পষ্ট ধারণা ও চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।তাহলে কিভাবে আমরা এই অভিযাত্রা থেকে শিক্ষা নেব? সালমান আল ফারিসির রাযি. ইসলামের পথে যাত্রাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে ফেলা যায়। প্রতিটা ভাগেই রয়েছে গভীর শিক্ষা। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার।)

অনুসন্ধিৎসু মানুসিকতা

সালমান আল ফারিসি রাযি. যখন প্রথম খৃস্টানদের গির্জায় তাদের প্রার্থনা শুনতে পান, তিনি তাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ও ভেতরে প্রবেশ করেন। এ থেকে স্পষ্ট ফুটে ওঠে তার অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা। সত্যকে খুঁজে পেতে হলে নিজের মানসিকতাকে প্রশস্ত করার কোন বিকল্প নেই। সালমান আল ফারিসি (রা) যদি তাদের প্রার্থনা দেখে, 'আরে ধুর! এইসব কী আজগুবি কাজ?' বলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন, তবে হয়তো তিনি সত্যের সন্ধানে সার্থক হতেন না।

উপস্থিত প্রমাণকে গুরুত্ব প্রদান

সালমান আল ফারিসি রাযি. সারাটি দিন সেই গির্জায় কাটিয়ে দেন। তাদের প্রার্থনা দেখেন, তাদের কথা শোনেন। তাদের অবলোকন করেন। এতে সত্যানুসন্ধানে সময় প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। তিনি যদি ঢুকেই এদিক ওদিক চেয়ে 'কী সব হাবিজাবি' বলে বের হয়ে যেতেন, তবে তিনি তাদের দ্বীনের ব্যাপারে অল্পই জানতে পারতেন।

দ্বীনের মূল অন্বেষণ

সালমান আল ফারিসি রাযি. পাদ্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাদের এই ধর্মের উৎস কোথায়? কিভাবে এল? কোথা থেকে এল? তারা জানায় এ ধর্মের উৎস শাম। এখান থেকে বোঝা যায় সত্য ধর্ম খুঁজে পেতে অন্যান্য ধর্মের মূল উৎসগুলোর ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করা, উৎসের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আপোষহীনতা

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে বাবাকে সব খুলে বলেন সালমান রাযি.। বাবা যথারীতি এর ঘোর বিরোধিতা করলেও সালমান আল ফারিসি রাযি. সরাসরি তাকে বলে দেন,আল্লাহর কসম! এ ধর্ম আমাদের ধর্মের চাইতে উত্তম। সালমান রাযি. তার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু সত্যের পথে থাকতে তার আবেগকে তিনি প্রাধান্য না দিয়ে স্পষ্টভাষায় ও অবলীলায় সত্য উচ্চারণ করেছেন।

অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করা

তার পিতা তাকে বেঁধে রাখার পরেও তিনি বাঁধন খুলে শামে পালিয়ে যান। এতে আমরা দেখতে পাই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে অন্যায়ের বিরোধিতা করার শিক্ষা। তার পিতা তার ওপর জুলম করলেও তিনি পিতার কাছে মাথা নত না করে বেরিয়ে পড়েন সত্যের উদ্দেশ্যে।

সর্বোত্তম শিক্ষার অন্বেষণ

সালমান আল ফারিসি রাযি. শামে পৌঁছেই শামবাসীকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে এই ধর্মের সবচেয়ে বড় পন্ডিত কে? তিনি চাইলে যে কারো থেকেই এই ধর্মের দীক্ষা নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি খুঁজে বের করেছেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে। আমরা খাবার খেতে চাইলেও যেখানে সবচে ভালোটা খেতে চাই, কিন্তু দ্বীনের শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের অনেকের সেই দিকে খেয়াল থাকেনা। সালমান ফারসির রাযি. এই অনুসন্ধান আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান অন্বেষার শিক্ষা দান করে।

বিনয় ও অমায়িকতা

সালমান আল ফারিসি রাযি. যখন বিশপকে সামনে পেলেন, তিনি তাকে তার শিক্ষক হতে অনুরোধ করলেন। বিনিময়ে তিনি তার সেবক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রস্তাব দিলেন। এখান থেকে দেখা যায় তার অমায়িকতা ও বিনয়ের দৃষ্টান্ত। এটা প্রত্যেক জ্ঞান অন্বেষীর জন্যে কর্তব্য যে, জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে বিনয়ী হতে হবে। অমায়িক হতে হবে। অতি আবেগ কিংবা ঔদ্ধত্য অন্তরে লালন করে জ্ঞান অন্বেষণ কখনো সফল হয়না।

বিশপের অসততা ও সালমান রাযি.'র সিদ্ধান্ত

সালমান রাযি. কিছুদিন যেতেই বিশপের অসততা দেখতে পেলেন। তার মন ভেঙ্গে গেল। হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি কি সেই ধর্মের দীক্ষা ছেড়ে দিয়েছিলেন? সত্যের সন্ধানে যাত্রা থামিয়ে দিয়েছিলেন? বলেছিলেন কি? 'আরে এদের আলেমরাই তো ঠিক নাই! ধর্ম কি ঠিক থাকবে!' এই চিন্তা করে তিনি আবার তার দেশে ফিরে যাননি; বরং তিনি এগিয়ে গেছেন নতুন কোন শিক্ষকের খোঁজে, যিনি তাকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেবেন। অনেকেই আছেন, যারা কতিপয় মুসলিমের অসৎ আচরণ দেখে ইসলামকে ঘৃণা করতে শেখেন। তাদের জন্য সালমান রাযি.'র এই বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত একটি প্রাণবন্ত শিক্ষণীয় উদাহরণ।

ধৈর্যশীলতা

সালমান রাযি. একের পর এক উস্তাদের কাছে ছুটে গেছেন সত্যের দেখা পাওয়ার জন্যে। একজন মারা গেছেন তো তিনি নতুন উদ্যমে পরবর্তী উস্তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। এতে সত্যকে খুঁজে নিতে তার অপরিসীম ধৈর্য আমাদের ধৈর্যশীলতার শিক্ষা দেয়। অনেকেই সত্য দ্বীনের ব্যাপারে দুই চার লাইন পড়েই মনে করেন হয়ে গেছে। আর দরকার নাই। আমি অনেক জেনেছি। অথচ তারা কতই না বিভ্রান্তিতে আছে!

লজ্জাকে প্রশ্রয় না দেয়া

সালমান আল ফারসি রাযি. যখন দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে যান, তখন তিনি অপমানিত হলেও তা প্রকাশ না করে এগিয়ে গেছেন সামনে। এমনকি মদীনায় যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এই ভেবে তিনি উৎফুল্ল ছিলেন যে, এই তো সেই শহর যেখানে আল্লাহর রাসূল সা. আসবেন। সেই ক্ষণের জন্যে তিনি দিন গুনছিলেন আর দাসত্ব করছিলেন এক ইহুদীর। শুধু তাই না। যখন প্রথম রা রাসূলুল্লাহ সা. এর মদীনা আসার খবর শুনতে পেলেন, তিনি গাছ থেকে নেমে দৌঁড়ে খবর প্রদানকারীর কাছে যান। যার ফলে তাকে মনিবের চড় খেতে হয়। এত অপমান সহ্য করেছেন শুধু সত্যানুসন্ধানের জন্য।

পূর্বে প্রেরিত কিতাবের তথ্য যাচাই

সালমান রাযি. তাঁর উস্তাদের কাছ থেকে ইঞ্জিল ও তাওরাতে রাসূল সা. ব্যাপারে যা যা বলা ছিল তা বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখলেন। এবং হুবহু মিল পেয়ে তাঁর নবুয়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। সালমান রাযি. এর এই নীতি অনুসরণ না করার ফলে বর্তমানে বেশ কিছু ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে। যদিও তাদের আলেমরা ঠিকই রাসূল সা. এর ব্যাপারে তাদের কিতাবে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে অবগত; কিন্তু বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখতে তারা একেবারেই রাজি নন। ফলে তারা অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

সত্যানুসন্ধানে একাগ্রতা

সালমান আল ফারসি রাযি. চাইলে অল্প পরিশ্রমেই তার যাত্রা শেষ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সত্যের একেবারে নিকটে না পৌঁছে যাত্রা বিরতি করতে রাজি ছিলেন না। আবু হুরাইরার রাযি. এর সেই হাদীসেই তা ফুটে উঠেছে, যেখানে রাসূল সা. বলেছিলেন-

'তার নামে শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! 'ঈমান' যদি আস সুরাইয়া (সপ্ত তারকারাজি) এর কাছেও থাকতো, তাহলে এদের (সালমান আল ফারসি রাযি. এর) মত মানুষগুলো ঠিকই তা খুঁজে নিত।'

এর মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় সত্যের সন্ধান পেতে কতটা ইখলাস প্রয়োজন, কতটা একাগ্রতা প্রয়োজন। সত্য যেখানেই থাকুক, আমি তার সন্ধান নিয়ে ছাড়বই- এই মানসিকতার দীক্ষা আমরা পাই সালমান আল ফারসির রাযি. জীবন থেকে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সালমান আল ফারসির রাযি. জীবনের এই দুঃসাহসিক ও বিস্ময় জাগানিয়া সত্যের পথে যাত্রার গল্প থেকে সঠিক শিক্ষা লাভ করার তাওফীক দান করুন।

কুড়ান মতি

আমার জীবন, অনুভব,
অনুভূতি জুড়ে রয়েছে জিহাদ,
পবিত্র জিহাদ।

ইমাম আবদুল্লাহ আযযাম

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)

-মাওলানা আসেম উমর

''তোমাদের প্রতিজ্ঞা থেকে আমরা পাই হিম্মত''

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ১৬৪ হিজরী মোতাবেক ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের আগেই তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়। যার ফলে তাঁর আম্মা সর্বাত্মক সাহসিকতা এবং হিম্মতের সাথে তাঁকে লালন-পালন করেন। শিশুকালেই তিনি কুরআন হিফজ করেন। তিনি দীনি ইলমের মধ্যে হাদীসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্ত ছিলো। ফেকাহ শাস্ত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এতো মর্যাদা দিয়েছেন যে, আজ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে তাঁর ফেকাহ বিদ্যমান। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর 'মুসনাদে আহমদ' অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম।

ইমাম শাফেয়ী রহ. (১৫০-২০৪ হিজরী/৭৬৭-৮২০ ঈসায়ী) বলেন, আমি এমন অবস্থায় বাগদাদ ছেড়েছি, যখন সেখানে আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে বড় কোনো মুত্তাকীও ছিল না, কোনো ফকীহও ছিল না।

মসনদে হাদীসে বসলে হাদীসের তালেবানরা পতঙ্গের ন্যায় তাঁর চারপাশে জমা হতো। তাঁর একেকটি দরসে পাঁচ হাজার করে শ্রোতা থাকতো। আত্মসম্মানবোধে তাঁর উপমা তিনি নিজেই। তিনি কখনো তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর কোনো হাদিয়া গ্রহণ করেননি। তাঁর নম্রতা এবং ভদ্রতা এতো বেশি ছিলো যে, ইয়াহইয়া বিন মুঈন (১৫৮-২৩৩ হিজরী/ ৭৭৫-৮৪৮ ঈসায়ী) এর মতো ইমাম সাক্ষী দেন, আমি আহমদ বিন হাম্বলের মতো লোক দেখিনি। আমি তাঁর সাথে ৫০ বছর ছিলাম। তিনি কখনো আমাদের সামনে নিজের যোগ্যতা এবং সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করেননি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এবং খলকে কুরআনের ফেতনা

খলিফা মামুনুর রশীদ (১৯৮-২১৮ হিজরী/৮১৩-৮৩৩ ঈসায়ী) ইউনানী দর্শন এবং যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। তার শাসনামলে মুতাযেলা ফেরকা খুব শক্তিশালী হয়। তাদেরকে সে সময়ের আলোকিত বুদ্ধিজীবি মনে করা হতো। তারা প্রত্যেক বিষয়কে আকল দ্বারা পরখ করায় অভ্যস্ত ছিলো। (মনে রাখা উচিত, বর্তমানের মডার্ন ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী মুবাল্লিগগণ, নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ এ যুগের মুতাযেলা। তারা প্রতিষ্ঠিত দীনকে আকল দ্বারা পরখ করার পর মেনে নেন। যদি কোনো হাদীস অথবা কোনো হুকুম তাদের ক্ষুদ্র আকলে বুঝে না আসে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করেন।)

মুতাযেলারা নতুন নতুন ইখতেলাফের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমার ঐক্যকে টুকরো টুকরো করেছে। ইসলামের দুশমন শক্তিগুলো সাধারণ বিষয়কে জনসাধারণের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন এটাই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা ইলমী এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্যবিষয়কে কুফর ও ঈমানের বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করে। আল্লাহ তাআলার স্বত্তা এবং গুণাবলির ব্যাপারে মানুষের অন্তরে এমন এমন প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে, সাধারণ মানুষ পেরেশান হয়ে যায়। এমনিভাবে তারা একটা বিষয় উপস্থাপন করে- 'কুরআন মাকলুক, নাকি মাখনুক নয়?' মুতাযেলারা কুরআন মাখলুক হওয়ার কথা বলে। তৎকালীন হুকুমত তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলো। আর তাদের মোকাবিলায় ছিলেন মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের বিশাল দল। যারা ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ধারক বাহক। আহলে সুন্নাত 'কুরআন' মাখলুক না হওয়ার পক্ষে অর্থাৎ আল্লাহর কালাম হওয়ার পক্ষে ছিলেন। চক্রান্তের বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য ছিলো- মুসলমানদের অন্তর থেকে কুরআনের বড়ত্ব, গুরুত্ব এবং মর্যাদা বের করে দেয়া। যাতে উম্মত হেদায়াতের মূল ঝর্ণা থেকেই দূরে ছিটকে পড়ে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর দূরদৃষ্টি এই ফেতনার দূরাগত প্রভাব দেখছিলো। সুতরাং হককে হক এবং বাতিলকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইমাম সাহেব রহ. সবকিছু কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

খলীফা মামুন 'খলকে কুরআনে'র মাসআলাকে খুবই গুরুত্ব দেয়। ২১৮ হিজরীতে বাগদাদের গভর্ণর ইসহাক বিন ইবরাহিমের নামে বিস্তারিত এক ফারমান পাঠায়। যাতে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কঠোর সমালোচনা এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। তাঁদেরকে 'খলকে কুরআনে'র আকিদায় ইখতেলাফ করার কারণে- তাওহীদে ত্রুটি, সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়, ফাসাদপ্রিয় ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। (বর্তমানেও মুতাযেলা নামক বাতিলদের সামনে মাথা না নোয়ানো ব্যক্তিদেরকে ফেতনাবাজ, সন্ত্রাসী বলা হয়।) হাকিমকে হুকুম করা হলো, যেসব লোক এই মাসআলার পক্ষে না আসবে, তাদেরকে তাদের পদ থেকে বরখাস্ত করে দাও। তারপর মামুন আরো কঠোরতা করলো। সরকারী কর্মকর্তা এবং আলেমগণের জন্যও এই ব্যাপারে মুতাযেলাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা বাধ্যতামূলক করে দিলো। ইসহাক বড় বড় আলেমদের একত্রিত করলো এবং তাদের সাথে এ মাসআলার ব্যাপারে আলাচনা করলো। তারপর এই আলাচনা লিখে মামুনের নিকট পাঠিয়ে দিল। মামুন সবকিছু পড়ে খুবই রাগান্বিত হলো এবং সেসব আলেমগণের মধ্যে বাশার বিন ওয়ালিত ও ইবরাহিম বিন মাহদীকে হত্যার নির্দেশ দিল। আর বাকিদের

ব্যাপারে লিখলো, যারা নিজের রায় থেকে ফিরে না আসবে তাঁদেরকে পায়ের উপর ঝুলিয়ে তার নিকট পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। বাকি আলেমগণের মোট সংখ্যা ছিলো ত্রিশ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল চারজন নিজের রায়ের উপর স্থির থাকেন তাঁরা হলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ., সাজ্জাদাহ, কওয়ারিরী এবং মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ.। তাঁদের মধ্যেও সাজ্জাদাহ দ্বিতীয় দিন এবং কওয়ারিরী তৃতীয় দিন নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন।

ইমাম সাহেব এবং মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ. শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান ধরে রাখেন। সুতরাং ইমাম সাহেব রহ. এবং মুহাম্মাদ রহ. কে হাতকড়া এবং বেড়ি লাগিয়ে মামুনের নিকট তরসুসে (বর্তমান তুরস্কের একটি শহর) পাঠিয়ে দেয়া হয়। সম্ভবত হাতকড়া এবং বেড়ি এমন বরকতময় হাত-পায়ে চুমো দেয়ার জন্যই বানানো হয়েছিলো। ইমাম সাহেব রহ. এর সহযাত্রী এবং সহমর্মী অন্যান্য স্থানের উলামায়ে কেরামও ছিলেন। এসব উলামায়ে কেরাম রাস্তায় থাকাবস্থায়ই মামুনের মৃত্যুর খবর আসে। সুতরাং সকল উলামায়ে কেরামকে বাগদাদের গভর্ণরের নিকট বাগদাদ পাঠিয়ে দেয়া হয়। পথেই মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ. এর ইন্তেকাল হয়ে যায়।

মামুনের পর মুতাসিম খলিফা হয়। মামুন তার স্থলাভিষিক্তকে খলকে কুরআনের মাসআলার ব্যাপারে কঠোরভাবে অসীয়ত করেছিলো– যেনো সে এই শিক্ষার উপর আমল করে। সুতরাং মুতাসিমের সামনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. কে মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) করার জন্য আনা হলো। ইমাম সাহেব রহ.কে যখন মুনাযারার জন্য আনা হয়, তখন তাঁর পায়ে চারটি বেড়ি লাগানো ছিলো। তিন দিন পর্যন্ত মুনাযারা হয়। কিন্তু ইমাম সাহেব রহ. আপন বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। বাগদাদের হাকিম ধমক দিলো, যদি তুমি কথা না মানো তাহলে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। এমন জায়গায় ফেলে দেয়া হবে যেখানে কখনো সূর্যের আলা পৌঁছে না।

আখেরাতের সওদায় যাঁদের অন্তর ভরপুর, যাঁদের সিনা নবুওয়াতের নূরে আলোকিত, তাঁদের জন্য দুনিয়া কেড়ে নেয়ার ধমকি অথবা আলো থেকে বঞ্চিত করার হুমকি কোনো অর্থ বহন করে না। সুতরাং তিনি কোনো ধমকে প্রভাবিত হলেন না। ভরা মজলিসে সরকারী উলামা–মাশায়েখের সাথে মুনাযারা করতে থাকেন। তাঁর একটাই জবাব ছিলো, তোমরা যা বলছো তার পক্ষে কুরআন হাদীসের কোনো প্রমাণ নিয়ে আস, আমি তা মেনে নেবো। তাঁর সাহসিকতা এবং নির্ভিকতা খলিফা মুতাসিমকে প্রভাবিত করলো। যার ফলে সে ইমাম সাহেব রহ. এর উপর নরম হতে লাগলো। সে ইমাম সাহেব রহ.কে বলল, যদি আপনি আমার অগ্রজের হাতে না লাগতেন, তাহলে কখনো আমি আপনাকে স্পর্শ করতাম না। কিন্তু দরবারী উলামা–মাশায়েখ তাকে উত্তেজিত করতে থাকে। মানুষ বলবে, মুতাসিম তার ভাই মামুনের বিশ্বাস থেকে সরে গেছে।

সরকারী উলামা–মাশায়েখদেরও সীমাবদ্ধতা ছিলো। এই মাসআলার ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে যে পুঁজি ভাগে আসতো, তা–ই ছিলো তাদের পেটের ইন্ধন। কুরআন–সুন্নাহ নিয়ে তাদের কী গরজ পড়েছে? তাদের উদ্দেশ্য একটাই, খায়েশ পূর্ণ করা, দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করা, রাষ্ট্রীয় পদের ফায়দা লোটা এবং সরকারী দরবার থেকে পাওয়া টাকাকড়ি দিয়ে ঘরের সিন্দুক পূর্ণ করা। এ ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না যে, ইতিহাস তাদের ব্যাপারে কী বলবে, আগামী প্রজন্ম তাদেরকে কিভাবে স্মরণ করবে, আখেরাতে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তারা কোন অবস্থায় দাঁড়াবে– আকায়ে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুদের সাথে নাকি দুশমনদের সাথে?

তারপর তৃতীয় দিন মুতাসিম ইমাম রহ.কে বললো, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো। তিনি জবাব দিলেন, কুরআন ও হাদীস থেকে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসো।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের হাত কেটে ফেল

মুতাসিম খুব রাগান্বিত হলো। জল্লাদকে হুকুম দিলো, তাঁর হাত কেটে দাও। জল্লাদ তাকে চাবুকের দুই ঘা বসিয়ে দিল। তারপর অন্য জল্লাদ নিয়ে আসা হলো। এভাবে প্রত্যেক জল্লাদ পূর্ণ শক্তিতে দুই ঘা করে মেরে পিছনে হটে গেলো। উনিশ চাবুক মারার পর মুতাসিম পুনরায় ইমাম সাহেবের সামনে এসে বললো, কেনো নিজের প্রাণের মায়া করছো না? আল্লাহর কসম! তোমার জন্য আমার মন কাঁদে।

যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেয় এর উপর অবিচল থাকে, এমন আত্মবিশ্বাসীদের জন্য আসমান থেকে রহমতের ফেরেশতা নেমে আসে। যাঁরা তাদের অন্তরকে প্রশান্তি দিতে থাকেন এবং হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আজও আল্লাহ তাআলার এই সুন্নত প্রতিষ্ঠিত আছে। আজও দুনিয়া জুড়ে কারাগারগুলো এমনিভাবে সেসব আল্লাহ ওয়ালাদের দিয়ে ভরে আছে, যারা বাতিলের সামনে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করেছে। যদি জুলুমের সামনে কেউ না দাঁড়াতো, তাহলে প্রত্যেক জালেম বিজয়ী হতো। প্রত্যেক অত্যাচারী কামিয়াব এবং সফল হয়ে যেতো। আর দুর্বল হৃদয়ের মানুষরা ছন্নছাড়া হয়ে যেতো এবং নিজেদের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুনির্দিষ্ট আশা ছেড়ে অত্যাচারী আর জালেমের দীন গ্রহণ করতো।

চাবুকের উনিশ ঘা খাওয়ার পরও ইমাম সাহেব রহ. এর আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞায় সামান্যতমও ফাঁটল ধরেনি। তিনি সেই জবাবই দিলেন, যা প্রথমে দিয়েছিলেন। মুতাসিম পুনরায় চাবুক মারার হুকুম দিলো। তারপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

সেই চাবুকের ব্যাপারে কথিত আছে, তা এমন চাবুক ছিলো, যদি তার একটি ঘাও কোনো হাতিকে মারা হতো, তাহলে হাতি চিৎকার করে পালিয়ে যেতো। ইমাম সাহেব রহ. রোযা ছিলেন। কেউ বলল, আপনার জান বাঁচানোর জন্য এই আকিদা মেনে নেয়ার সুযোগ আছে; কিন্তু তিনি তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না। লোকেরা তাঁকে বুঝাতে চাইলেন এবং জান বাঁচানোর হাদীস শুনালেন। তিনি জবাব দিলেন, তাহলে খাব্বাব রা. এর হাদীসের জবাব কী? যাতে

বলা হয়েছে- প্রথমে কিছু লোক এমন ছিলো, যাদের মাথার উপর করাত চালিয়ে দেয়া হতো, তারপরও তাঁরা নিজের দীন থেকে সরে আসতো না। একবার কোন একজন তাঁকে জিজ্ঞেসা করলো, আপনি এসব করছেন আপনার ভয় হয় না? এর জবাবে তিনি বলেন, ভয়তো সে পাবে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। ইমাম সাহেব রহ.কে দু'বছর চার মাস কারাগারে রাখা হয়। এসময়ে ৩৩/৩৪ বার চাবুক মারা হয়। আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত' গ্রন্থে লেখেন, ইমাম আহমদ রহ. এর উপমাহীন দৃঢ়পদ এবং অটলতার দরুন এই ফেতনা চিরদিনের জন্য খতম হয়ে যায়। ফলে মুসলমানরা এক ভংকর দীনি ফেৎনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। যারা দীনের সেই ক্রান্তিকালে তৎকালীন হুকুমতের সঙ্গ দিয়েছে, সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়েছে এবং মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে কাজ করেছে, তারা অখ্যাত হয়ে গেছে তাদের দীনি এবং ইলমী গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ রহ. এর শাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁর মহব্বত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং সহীহ আকিদাসম্পন্ন মুসলমানদের পরিচয় হয়ে আছে। তাই তাঁর সমকালীন ব্যক্তিত্ব কুতাইব বলেন, যখন তোমরা কাউকে দেখবে আহমদ বিন হাম্বলের সাথে তার মহব্বত আছে, তাহলে বুঝে নিবে সে সুন্নাতের অনুসারী। অপর একজন আলেম আহমদ বিন ইবরাহিম দাওরাকী রহ. বলেন, যাকে তোমরা আহমদ বিন হাম্বলের সমালোচনা করতে শুনবে, তার ইসলামকে তোমরা সন্দেহের চোখে দেখবে। [তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত ১:১০০]

ইমাম সাহেব ৭৭ বছর বয়সে ১২ রবিউল আওয়াল জুমার দিন ২৪১ হিজরী/৮৫৫ ঈসায়ীতে মাবুদে হাকীকির সাথে মিলিত হন। ইন্তেকালের সংবাদ শুনতেই গোটা শহর ছুটে আসে। তার জানাযার মতো এতো ভিড় ইতোপূর্বে অন্য কারো জানাযায় দেখা যায়নি। জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার ব্যাপারে বলা হয়, ৮লক্ষ পুরুষ এবং ৬০ হাজার নারী উপস্থিত ছিলো। অবিচলতার এই ইতিহাস ওই সওদাগর কখনোই বুঝতে পারবে না, যার শিরায় শিরায় মাসলাহাত প্রবাহিত হয়। যে দীনের প্রত্যেকটা বিষয়কে দুনিয়াবী লাভ-ক্ষতির মাপকাঠিতে পরখ করার পর তা হক-বাতিল হওয়ার ফায়সালা করে। তাদের দৃষ্টিতে এসব অবিচলতাকে জযবার অতিরঞ্জন, প্রাবল্য এবং হেকমত ও মাসলাহাত পরিপন্থী-ই মনে হবে।

অতীত আমাদের আয়না

খলকে কুরআনের ফেতনার ব্যাপারে হুকুমতের সঙ্গ দানকারীদের সরকার- বাহবা দিবে, তাদের জ্ঞান-গরিমা, মধ্যমপন্থা এবং উদার মন মানসিকতার জয়ধ্বনি দেয়া হবে। শাহী দরবার থেকে তাদের ব্যাপারে দেশপ্রেমিক, দেশ ও জাতির দরদী, শান্তিবাদী এবং কল্যাণকামী হওয়ার খেতাব দেয়া হবে। কিন্তু এসব খেতাব এবং সম্মান পৃথিবীর ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে? আল্লাহ মালুম, তৎকালীন হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মদিয়া- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এসব সরকারী উলামাদের কিভাবে স্মরণ রেখেছে? হুকুমতের পক্ষ থেকে সম্মান দেয়ার পরও মুসলমানগণ তাদেরকে কী মর্যাদা দিয়েছে? তাদের নাম জানে এমন কতজন আছে বর্তমানে? অথবা তাদের মোকাবিলায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. কে তৎকালীন হুকুমত ফেতনাবাজ, ফসাদপ্রিয় ইত্যাদি নাম দিয়েছিলো। আল্লাহ তাআলা তাকে কেমন ইজ্জত দিয়েছেন? তার জন্য রহমতের দোয়া করে। এটাই ইতিহাসের সবক। কিন্তু ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহণকারী খুব কমই থাকে। অতীতের ইতিহাসকে অতীতের মতই মস্তিস্ক থেকে অতীত হয়ে যায়। এ কথা চিন্তা করে না যে, বর্তমানেও তেমন ইতিহাস লেখা হচ্ছে। যার ফলে মানুষ তার যুগে ঘটমান ঘটনাপ্রবাহ সেই দৃষ্টিতে দেখে না, যে দৃষ্টিতে ইতিহাসকে দেখে থাকে। বর্তমানের ঘটনাগুলোকে খুবই সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। কেউ কোনো দলের গণ্ডিতে, কেউ মাযহাবের গণ্ডিতে, কেউ দেশের গণ্ডিতে বন্দী হয়ে এগুলো দেখে। এমনিভাবে নিজের যুগের রাষ্ট্রের বক্তব্য অনুযায়ী যাদের বিরোধিতা করছে, তাদেরকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে। তারা এ কথা ভুলে যায়, আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর বিরোধীরাও তাকে রাষ্ট্রের বিদ্রোহী, আমীরুল মুমিনীনের অবাধ্য, উম্মতের মধ্যে ফাঁটল সৃষ্টিকারী, হেকমত এবং মাসলাহাত পরিপন্থী হিসেবে দেখেছিলো।

প্রত্যেক যুগের হক্ব-বাতিলের মৌলিক রূপ এক রকমই হয়ে থাকে। প্রতিপক্ষ এবং অস্ত্র ভিন্ন হতে পারে। তাদের মোকাবিলাকারী এবং তাদের যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তবে মূল ভিত্তি একই হয়। কিন্তু মানুষ বর্তমানকে ভুলে যায়। আল্লাহর অগণিত রহমত বর্ষিত হোক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর উপর। তার পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর, যারা তারই মত কন্টাকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে মনযিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত বিশ্ব চরাচরে হক-বাতিলের লড়াই অব্যাহত থাকবে, ততদিন এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। বাতিল যেই আকৃতি নিয়েই আসুক না কেনো, হকের পক্ষ থেকে কোনো আবু হানিফ রহ. অথবা কোনো ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. অবশ্যই দাঁড়িয়ে যাবে।

পাকিস্তানের ফেরাউন- পারভেজ মোশাররফ প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পৃষ্ঠপোষাক। এটা কিভাবে হতে পারে যে, বাতিল প্রকাশ্যে ভ্রষ্টতা ছড়াবে অথচ হকের সারি থেকে কেউ তার মোকাবিলায় দাঁড়াবে না? যদি এমনটি-ই হতো তাহলে হক বাতিলের লড়াইয়ের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যেতো। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সেই ইতিহাসকে পূর্ণ করার জন্য পারভেজ মোশাররফের মোকাবিলায় হকের ইমাম, শহীদ মাতা-পিতার গাজি ছেলে, গাজি আব্দুর রশীদ শহীদ রহ. কে পাঠিয়েছেন। যাতে আহলে হক্বকে কেউ অপবাদ দিতে না পারে যে, হে অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্বকারী! তোমাদের কী অবস্থা?

গাজি আব্দুর রশীদ রহ. নিজেকে এবং জামিয়া হাফসার ছাত্রীদের কুরবানী দিয়ে বস্তুত বর্তমানের ইতিহাসকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। হে আল্লাহ! অসংখ্য অগণিত রহমত বর্ষণ কর গাজি শহীদ রহ. এর উপর এবং সেসব আত্মমর্যাদাবান ছাত্রীদের উপর, যারা পুরুষদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিয়ে দীনি মর্যাদার মান বাঁচিয়েছে।

মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের মোটরসাইকেল

১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মকাল। মধ্য এশিয়ার একটি দেশে দুজন আরোহী মোটর সাইকেলে করে ছুটে চলেছেন। বাহনটিতে দুজন আরোহী। কিছুদিন আগেই তারা কয়েকজন মিলে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন। একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ, একটি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। তিনি কাজটি করার জন্য যাদের সহায়তা পেয়েছিলেন তারা সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। সুশীল সমাজের বিশিষ্টজনদের কর্মব্যস্ততা এতই বেশি যে তাদের ফুরসত নেই মানুষের বিপদাপদে এগিয়ে যাবার। আরো কিছু লোক এগিয়ে এসেছিলেন সেই মোটর সাইকেল আরোহীদের আহবানে সাড়া দিয়ে। তাদের কেউ স্থানীয় ব্যবসায়ী কিংবা স্বচ্ছল কৃষক। তাদের ছোট্ট দলটি গঠিত হয়েছিল মাদ্রাসার শরীয়াহ বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র, মৌলভীদের নিয়ে। গ্রামের লোকদের জন্য সময়টি ছিল উৎসবের। বিয়ের অনুষ্ঠান, বরযাত্রী চলছে দলবেঁধে; কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির হাইওয়েতে কোন নিরাপত্তা নেই, ডাকাত আর চোরের দলের উৎপাত এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, রাস্তার পাশে মরা লাশ পড়ে থাকলেও তা লোকজনের কাছে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এতটাই স্বাভাবিক যে, কেউ গাড়ি থামিয়ে লাশটিকে কবর দেয়া দূরে থাক, পথচারীরা পর্যন্ত দুবার ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করে না। এহেন পরিস্থিতিতে, যে বিপদের আশংকা ছিল, ঘটলো তা-ই। বরযাত্রীদের দল হাইওয়ে ডাকাতদলের খপ্পরে পড়ল। হতাহতের ঘটনা ঘটল। মহিলাদের উঠিয়ে নেয়া হল অপহরণ আর ধর্ষণের জন্য।

স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের গণ্ডারের চামড়ায় সাধারণত ময়না তদন্তের আগে অনুভূতি হয় না। মাদ্রাসার একজন মোল্লা এই ঘটনায় ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলেন। তিনি বের হলেন 'আমর বিল মা'রুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার' এর ডাকে, সাথে ছিল মাদ্রাসার ছাত্ররা, যাদের বলা হয় তালেব। তালেবের বহুবচন 'তালেবান' মানে অনেকগুলো ছাত্র। কিছু মহিলাদের উদ্ধার করা সম্ভব হলো, আবার অনেকে ইতোমধ্যে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গ্রামের লোকজনের আবেদনে যে প্রশাসন নির্বিকার ছিল সেই প্রশাসনকে বসিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। কাবুলের শাসক রব্বানীর অনুগত গভর্ণর ও তার প্রশাসনকে কান্দাহার প্রদেশের গ্রামের লোকেরা বের করে দিল। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সাথে তারা স্বেচ্ছায় তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব তুলে দিল যে লোকটির হাতে তাঁর নাম মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ। যিনি সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিলেন চোর আর ডাকাতদলের হাত থেকে মুসলিম নারীদের ইজ্জত রক্ষা করার ডাকে সাড়া দিয়ে। কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, একা এভাবে এগিয়ে যাবার শক্তি তিনি কোথায় পেলেন? কিভাবে তিনি বাকি লোকদেরকেও সাহসী অগ্রযাত্রার সাথী করে নিলেন? আসুন শুনি তাঁর নিজের জবানীতে, 'তখন আমি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করি, মাদ্রাসাটি ছিল 'সানজ সার' শহরে, কান্দাহারে। আমার সাথে আরও প্রায় ২০ জনের মত সহপাঠী ছিল। এরপর দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ল, খুন, হত্যা, লুটতরাজ, ডাকাতি এগুলো সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, আর দেশের নিয়ন্ত্রণ ছিল দুর্নীতিবাজ, বাজে সমাজপতিদের হাতে। 'এই সমাজের অবস্থার উন্নতি ঘটবে, আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে' সবচেয়ে আশাবাদী লোকেরাও এমন আশা করা ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি আমি নিজেও তাদের মতই ভাবছিলাম। এরপর নিজেকেই বললাম, 'আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকেই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না' (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৮৬) এরপর আমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট ছিল, নইলে আমি হয়তো এই বিষয়গুলো ছেড়ে দিতাম। কারণ কোন কিছুই আমার সামর্থের মধ্যে ছিল না।

কিন্তু আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম, খাঁটি ভরসা। আর যে কেউ আল্লাহর ওপর এ পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে, তার আশা কখনো হতাশায় পরিণত হয় না। মানুষ হয়তো ভাবতে পারে, কখন এই আন্দোলন শুরু হল? কারা এর পিছনে ছিল? অর্থায়ন কারা করল? পরিচালনা করল কারা? আর নিয়ন্ত্রণ করল কারা? আমি তাদের বলব, এই আন্দোলন তো শুরু হয়েছে সেদিন, যেদিন আমি আমার মাদ্রাসাতে টেবিলের ওপর বইটি ভাঁজ করে রেখে সাথে আরেকজন ভাইকে নিলাম, এরপর আমরা দুজনে মিলে পায়ে হেঁটে জানযাওয়াত এলাকার দিকে গেলাম। এরপর সেখান থেকে আমি একটি মোটরসাইকেল ভাড়া নিলাম। যে আমাকে ভাড়া দিয়েছিলেন তার নাম ছিল 'শুরুর'। এরপর আমরা তালুকান এলাকায় গেলাম। আর এভাবেই আমাদের আন্দোলন শুরু হল।

আপনাদের মনে যদি অন্যকোন চিন্তা উঁকি দিয়ে থাকে তাহলে সেগুলো ঝেড়ে ফেলুন! এরপর আমরা এক মাদ্রাসা থেকে আরেক মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে দেখা সাক্ষাত শুরু করলাম। ছাত্রদের যে সকল হালাকা (স্টাডি সার্কেল) ছিল সেগুলোতে যেতাম। একদিন সকাল বেলায় আমরা একটি 'স্টাডি সার্কেলে' যাওয়ার পর দেখলাম, সেখানে ১৪ জনের মতো ছাত্র অবস্থান করছে। এরপর আমি তাদেরকে একত্রিত করলাম আমার চারপাশে, আর বললাম, 'আল্লাহর দীন এখন মানুষের পায়ের নিচে, মানুষ প্রকাশ্যে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা করছে, খারাপ কাজ করছে, আর অপরদিকে যারা দীন মেনে চলার চেষ্টা করছে তারা তাদের দীনকে গোপন করে আছে, আর অসৎ লোকেরা পুরো এলাকায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে আছে। তারা মানুষের সম্পদ চুরি করে, রাস্তায় তারা মানুষের ইজ্জত হানি করে, খুন করে। এমনকি যদি কারো মরা লাশ রাস্তার ওপর পড়েও থাকে, তাহলে

মানুষ নির্বিকার চিত্তে তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যায়। গাড়ি চালিয়ে চলে যায় আর দেখে রাস্তার ওপর একটা মরা পড়ে আছে। কোন লোক যে এসে লাশটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে দাফন করবে তাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমি তাদেরকে আরও বললাম, 'এই রকম জরুরী অবস্থার মধ্যে শুধু পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব না, চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব না। আর এই সমস্যাগুলো স্লোগান দিয়ে সমাধান করা সম্ভব না, যার পিছনে কোন সমর্থন নেই। আমরা তালেবে ইলম এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ওঠে দাঁড়াতে চাই। যদি তোমরাও সত্যি সত্যি চাও আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করতে, তাহলে আমাদের মাদরাসার আঙ্গিনা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আর আমি তোমাদেরকে খুলে বলছি, একটা মানুষও আমাদেরকে একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করার ওয়াদা করেনি। তাই তোমাদের এরকম মনে করার কোন কারণ নেই, আমরা আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করব আর বিনিময়ে অন্য কেউ আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিবে, বরং মানুষের কাছ থেকেই অনুরোধ করে আমাদের নিজেদের খাদ্য ও সাহায্য চেয়ে নিতে হবে।'

আমি বলেছিলাম, 'এটা একদিনের কাজ নয়, এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা এক বছরের কাজও নয়, বরং এতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। তোমরা কি সেটা করতে তৈরি আছ?'

'গ্রীষ্মের সেই দিনগুলো ছিল খুব গরমের। মনে হতো যেন কালো রঙয়ের কেটলীতে কেউ পানি গরম করছে আর আমি তাদেরকে এ বলে উৎসাহিত করতে লাগলাম যে, 'আজ এই রকম পরিস্থিতিতে তোমরা নিজ নিজ কেন্দ্রে বসে থাকতেই বেশি পছন্দ করছো! অথচ তারা সরাসরি আল্লাহর দীনের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর আমরা কিনা দাবী করছি আমরা আল্লাহর দীনের লোক! শরীয়াহর ছাত্র, অথচ আমরা শরীয়াহর সমর্থনে কোন কাজ করছি না!' কাজেই তোমরা বলো তোমরা কি এই কাজগুলো করতে তৈরি আছো?' কিন্তু সেই চৌদ্দজনের মাঝে একজনও খুঁজে পাওয়া গেল না, যে এই কাজ করতে তৈরি আছে, তারা বলল, 'জুমার দিনে হয়তো আমরা এই কাজগুলোর কিছু কিছু কাজ করতে পারি।' আমি বললাম, 'তাহলে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে কে এই কাজগুলো করবে?' আমি আল্লাহকে আমার সাক্ষী মেনে বলছি, এটাই ছিল বাস্তবতা, আর আমি যাবতীয় ইজ্জতের মালিক আল্লাহর সামনে শেষ বিচারের দিনে এই ঘটনার সাক্ষ্য দিব। আমাদের এই আন্দোলন আল্লাহর ওপর খাঁটি তাওয়াক্কুলের-ই ফল ছিল। কেননা, সেদিন যদি আমি ঐ কয়েকজন ছাত্রের ওপর ভিত্তি করে অন্যদের প্রতিও একই রকম ধারণা করে বসে থাকতাম, তাহলে হয়তো আমি নিজেও আমার পড়ালেখায় মন দিতাম। মাদ্রাসায় ফেরত যেতাম; কিন্তু আমি আল্লাহর নামে যে শপথ করেছিলাম তা পূর্ণ করার দিকে মন দিলাম। আমি যে শপথ করেছিলাম তা পূর্ণ করেছি, আর আল্লাহও আমাকে পরিচালিত করেছেন যেমনটা আজকে আপনারা দেখছেন।

এরপর আমি আরেকটি পাঠশালাতে গেলাম। সেখানে প্রায় সতেরজন ছাত্র ছিল। আমি তাদেরকেও উদ্ভূত পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলাম। এবার এই হালাকার সতেরজনের সবাইকেই পাওয়া গেল যারা আমাদের প্রস্তাবে আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করতে রাজী ছিল। সবার মাঝে অসাধারণ এক বন্ধন গড়ে ওঠে। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবার প্রতি সবাই ছিল খুব আন্তরিক। মোটকথা, কাজটি ছিল সম্পূর্ণ শরঈ ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। তাই এ কাজের শুরু থেকেই আমাকে একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এরপর আমরা যে একটি মোটর সাইকেল ভাড়া করেছিলাম, সেটিতে চড়ে একের পর এক মাদ্রাসা, স্কুল ও স্টাডি সার্কেলে ভ্রমণ করতে লাগলাম। আল্লাহর শোকর অল্প সময়ের মধ্যেই তিপ্পান্নজন লোক আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে কাজের জন্য তৈরি হয়ে গেল। এরপর আমি তাদেরকে আগামীকাল দেখা হবে বলে মাদ্রাসায় ফেরত আসলাম। কিন্তু তারা রাতের বেলায় সবাই একসাথে 'সানয সার' এ এসে হাজির হল। আর এটাই ছিল শুরু। আমাদের পরিকল্পনার বয়স চব্বিশ ঘণ্টা পার হবার আগেই আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেল। ফযরের নামাজের পর সেখানে উপস্থিত একজন বলল, "আজকে রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, ফেরেশতারা 'সানয সার' এলাকায় প্রবেশ করছে, আমি তাদের সাথে মুসাফহা করলাম। ওহ! কি কোমল ছিল তাদের হাতের পরশ। পরদিন সকাল দশটার দিকে হাজী বিশর নামক এক ভাই থেকে দু'টা গাড়ি চেয়ে নিলাম। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তিনি আমাদেরকে দুটো গাড়ি দিলেন, একটা ছোট কার, আরেকটা বড় কার্গো ট্রাক। এরপর আমরা সব ছাত্রদের 'কাশক নুখুদ' এলাকার দিকে সরিয়ে নিলাম। বাদবাকি অন্যান্যরাও আমাদের সাথে যোগ দিল। যখন একসাথে অনেক লোক জমায়েত হল, আমরা লোকদের কাছ থেকে অস্ত্র ধার করলাম। আর এভাবেই শুরু হয়েছিল আমাদের প্রতিরোধ আন্দোলন।' তাঁর বক্তব্য শেষ- আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন, বিজয় দান করুন এবং মুজাহিদিনদের সাহায্য করুন। আমিন।

হ্যাঁ, এটাই ছিল আন্দোলনের সূত্রপাত। আমেরিকা ইসলামিক আমিরাতের ওপর হামলে পড়ার আগ পর্যন্ত যা এক ধারায় চলছিল। যখন আমেরিকা এই ইসলামিক রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তারা ইতিহাসকে যেন পাল্টে দিল, তারা সাম্প্রতিক অতীতের এই বাস্তবতাকেও পাল্টে দিতে চাইল। তালাবাদের নাম দেয়া হল বিদেশী এজেন্ট, পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সের দেশীয় রক্তপিপাসু দোসর, লুটেরা, হাইওয়ে ডাকাত, খুনী- যারা কিনা যমীনে নিজেদের কর্তৃত্ব ও অনাচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়!!! আরও কত সহস্র পন্থায় অভিযোগ, ধোঁকা, চক্রান্ত করা হল এই ইসলামিক ইমারাহ'র বিরুদ্ধে। যে সকল লেখক বুদ্ধিজীবী এ ইমারার বিরুদ্ধে তাদের কলমবাজী করেছিল, মিথ্যার বিষ ছড়িয়ে ছিল এরা মূলত বিকৃত মন-মানসিকতার শিকার স্বজাতির গাদ্দার, পরজীবী। সত্যানুসন্ধানী মানুষগণ জানেন, তালেবান কোনদিনই পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সের খেলনা ছিল না। এখন আমেরিকা এবং পাকিস্তান সরকার উভয়েই তাদের দিকে এক তীরে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করছে। আর এখন তালেবান সারা দুনিয়ার কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারাও রাজনীতি বুঝে। তারা আমেরিকানদের ফাঁদে পা দেয় না, মুনাফিকদের ফাঁদে পড়ে না।

আমরা পুনরায় ফেরত যাচ্ছি সেই আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের দিকে, 'কান্দাহারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, দলে দলে তালেবে ইলমদের বহর আসতে লাগল, কান্দাহারের সীমানাবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলো থেকে জনসাধারণ আসতে লাগল, তারাও এই তালেবে ইলমদের কাছে অনুরোধ জানাল যেন তাদের প্রদেশের কর্তৃত্ব নেয়া হয় এবং সেখানেও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারা সেই প্রদেশগুলোতে কর্তৃত্ব ও শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সহায়তা করতে লাগলেন। আর এভাবেই, তালিবান ('তালিবান'- 'তালেব' শব্দটির পশতু বহুবচন, যার অর্থ ইসলামী শরীয়াহ'র ছাত্রবৃন্দ-) আফগানিস্তানের এক পঞ্চমাংশ অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল, কোন ধরণের লড়াই ছাড়াই, বরং এখানে মানুষের নিরাপত্তা কামনা ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছাই ছিল প্রধান শক্তি। আলেম, মৌলভী, মোল্লাহদের সামাজিক মর্যাদার কারণে; শরীয়াহর ইলমের ছাত্রদের প্রতি মানুষের সম্মানবোধের কারণে কোন রকম বড় বাঁধা ছাড়াই তালেবানরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল উত্তরের প্রদেশ, পূর্বে সবদিকে। আর কাবুলের শাসক রব্বানীর কাছে এই খবর পৌঁছেছিল যে, তার প্রতিদ্বন্দী হিকমতিয়ারের লোকেরা নিজেদের কাবুল থেকে পৃথক করে নিয়েছে, তাই তিনি তালেবানদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন অফিসিয়াল অবস্থান ঘোষণা করেননি বরং তিনি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সাহায্য করেন যেখানে মানুষের কাজের জবাবদিহিতা আছে। কিন্তু হিকমাতায়ার তার ফোর্সদের আদেশ করেন যেন তারা তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে।

তাই গযনী এলাকাতে কিছু সংঘর্ষ হল, এরপর উত্তরদিকে এভাবে কাবুলের দিকে একের পর এক এলাকা প্রায় উল্লেখযোগ্য কোন লড়াই ছাড়াই পতন হতে লাগল। এমনকি বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী যেমন চোর হাইওয়ে ডাকাত দল এরা পর্যন্ত শরীয়াহ ইলমের তালাবাহ বা ছাত্রদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে সংশয়ে ভুগতে লাগল। অন্যান্য দল যেমন, 'ইউনুস খালিস' এরপর 'হাক্কানী' ফোর্স বাতকিয়াতে, খোস্তে তাদের ভূমি সমর্পণ করল। সায়াফে অধিকাংশ ফোর্স লড়াই থেকে বিরত থাকলো। নানকারহারের রাজধানী জালালাবাদের লোকজন যখন তালেবানদের সামনাসামনি দেখল, তাদের শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা জানলো, 'আমর বিল মারুফ ওয়াননাহি আনিল মুনকার' এর কথা জানতে পারল, তাদের নিরাপত্তা, হাইওয়ে চোর-ডাকাত নিধনের কথা ইত্যাদি জানতে পারল, তারাও তালেবানদের সমর্থনে এগিয়ে এল। এরপর তালেবানরা কাবুলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল, সেখানে একটি সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ১৫০০ আলেমের উপস্থিতিতে ৩১ মার্চ হতে ৩রা এপ্রিলের সেই বৈঠকে মোল্লাহ মুহাম্মদ ওমরকে আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবানদের আমীর নিযুক্ত করা হল এবং উপাধি প্রদান করা হল 'আমীরুল মুমিনীন'।

আর সেদিন থেকেই তালেবানদের কাছে শরয়ী আমীর হিসেবে তিনি গৃহীত হয়ে আসছেন আর তাদের মতে তাকে একজন খলীফার যাবতীয় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তালেবানরা কাবুলের সীমান্তে পৌঁছে গেলেন আর রব্বানীর কাছে কিছু অনুরোধ নিয়ে গেলেন যার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে-

১. শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২. সরকার হতে কমুনিষ্ট ও তাদের অনুসারীদের অপসারণ করতে হবে।

৩. স্টেট ভবন হতে নারীদের অপসারণ করতে হবে।

৪. দুর্নীতি, পতিতালয়, সিনেমা, গান-বাজনা, অশ্লীল ভিডিও ইত্যাদি নির্মূল করতে হবে।

কাবুলের শাসক রব্বানী তালেবানদের সাথে আলোচনা করার জন্য দূত পাঠাতে বললেন, তাই তারা আলেমদের দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফোর্সদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন, এমনকি তারা তাদের অস্ত্র সোপর্দ করবেন, মারামারি বন্ধ করবেন আর আলোচনা শুরু করবেন এই প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরেও তারা প্রেরিত দূতদের একটি অংশকে হত্যা করে বাকীদের ফেরত পাঠায়। যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াইশ'জন। এরপর এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতার পরে তালেবানদের পক্ষ হতে কাবুল আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন পথই খোলা ছিল না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৬তম রজনীতে কাবুলের পতন হল। তালেবানরা ১৯৯৭ সালে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল জয় করল, আর বামিয়ান- আফগানিস্তানে রাফেযিদের কেন্দ্রের পতন হল ১৯৯৮ সালে, আর এর পূর্বে কায়ান উপত্যকা- যার নিয়ন্ত্রণে ছিল (শিয়া) আগাখানি ইসমাইলী সৈন্যরা- এরও পতন হল। আর এখানে তালেবানেরা যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র গনীমতের মাল হিসেবে লাভ করল তা গণনা করা কোন সহজ কাজ ছিল না। আর বলা হয়ে থাকে আহলুস সুন্নাহ গত ৮০০ বছরে এই উপত্যকায় কখনো প্রবেশ করেনি। আর এভাবেই মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে তালেবানরা আফগানিস্তানের ৯৫ ভাগ এলাকাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারল- যার শুরু হয়েছিল সেই সেদিনের মোল্লা মুহাম্মদ ওমর (আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন) এবং তাঁর ভাইদের একটি অন্যায়ের প্রতিবাদের থেকে, যখন তারা একতাবদ্ধ হয়েছিলেন একদল মুসলিম নারীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্যে যাদেরকে অপহরণ করেছিল কিছু চোর আর হাইওয়ে ডাকাতদল।



ইতিহাস

৯/১১ এ শুরু হয়নি

আনিকা ওয়ারদা তুবা

রাতের আঁধারে চুপচাপ শুয়ে আছে মেয়েটি। বিছানার একপাশে দলা পাকিয়ে বালিশে মুখ গুজে নিঃশব্দে কাঁদছে। শব্দ করার শক্তিও আর নেই। এই ছোট্ট জীবনে অনেককিছু দেখে ফেলেছে। পৃথিবীটাকে খুব নোংরা মনে হয়। এখানে এতো পশুর বাস। যেদিন থেকে ওর শরীরের ওপর আমেরিকান সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, সেদিন থেকেই সব কেমন যেন হয়ে গেছে। এখন সব স্বপ্ন আবছা লাগে। মুখ ভরা তেতো বিস্বাদ, জীবনটা কী কষ্টের! বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকা মধুর গল্পখানা কবে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। একজন পুরুষের উষ্ণ বুকে মাথা রেখে সব কষ্টটুকু উজাড় করে দিতে কখনো কি আর পারবে? সীমার শরীরটা কেঁপে ওঠে। আতঙ্কে ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে কিনা অন্ধকারে সেটা আর বোঝা যায় না।

সাকিব তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে। কতো দিন এই মাঠে এসে খেলেছে ওরা! একদল ছেলে মিলে একটা বলের পিছে ছুটোছুটি। গোল! প্রান্তের সাথে প্রথম এখানেই তো দেখা হয় তাইনা? এরপর দুজনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব। অথচ দুজনে সবসময় আলাদা টিমে খেলতো। কারণ ওদেরকে এক দলে ফেলা মানে খেলার ফলাফল জেনে যাওয়া। কতো রাত এই মাঠে এসে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিয়েছে। দুঃখের সময় বন্ধুর ঠাট্টা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে জীবনের সব হতাশা। আহ! বুকের মধ্যে চাপা কী একটা বিঁধছে? এটাই কি বেদনা? মার্কিনিদের ড্রোন অ্যাটাকে প্রান্ত মারা যাওয়ার পর এখন সাকিব একা। স্মৃতিগুলো চোখের পানিতে আবছা হয়ে আসে।

মুমিনার বিয়ে হয়েছে চার বছর। স্বামীর আদরে দুনিয়া ভুলে থাকে, ভুলতে পারে না একটা সন্তানের কথা। চার বছরেও স্বামীকে একটা সন্তান দিতে পারেনি ও। বিশাল সময়। মা ডাক শোনার হাহাকারে বুকটা খাঁ খাঁ করে। বহু প্রতীক্ষার পর ও মা হতে চলেছে! কী আনন্দের সেই দিন! নয়টা মাস ভারী শরীরটাকে যত্ন করে আগলে রাখে মুমিনা আর ওর স্বামী হাসিব। প্রথম সন্তান! আল্লাহর তরফ থেকে আসা এক অপূর্ব নেয়ামত। ফুটফুটে মেয়েটা জন্মের রাতেই একবুক মায়া জড়িয়ে বাচ্চার নাম রাখে আশা। কতো আয়োজন মুমিনার মেয়েকে নিয়ে! মেয়ে বড় হবে, পড়াশুনা করবে, বিয়ে হবে। কিন্তু কোথায় আশা? নরপশুগুলার গুলিতে ওর ছোট্ট বুকটা যে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ওকে মরাদেহ দেখে চেনা যায় নি। লাল একটা মাংসপিণ্ড কবরে নামিয়ে রেখেছে সবাই। ওটা কি আশা নাকি? আশার সেই মিষ্টি হাসিটা কোথায় মিইয়ে গেছে? কিছুই বোঝেনা মুমিনা। "মা-মা-মা"উদভ্রান্ত মায়ের অন্তরে এই একটা কথাই বাজতে থাকে। মা ডাকটা শোনার আগেই কে যেন তার অন্তরটাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

না-আ-আ-আ-আ-আ" মীরুর চিৎকারে আজো সবুজের ঘুমটা ভেঙে যায়। সবুজ তাকিয়ে থাকে। প্রায় অপ্রকৃস্থ স্ত্রীকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। মীরু তো এমন ছিল না! কতো হাসিখুশি একটা মেয়ে ছিল। বিনা কারণে হেসে বাড়ি মাথায় তুলেছে, কথায় কথায় সবুজের সাথে খুনসুটি করেছে, ছোট্ট ঝগড়ায় সারারাত কেঁদে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে, ইমোশনাল ছিল বলে সবুজের হালকা বকাও খেয়েছে। সেই মেয়ে আজ এতো অনুভূতিহীন? কথা বলে না, হাসে না, কাঁদে না, শুধু রাতের আঁধারে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে। মীরুকে চোখের সামনে এমন জীবন্ত লাশ বনে যাওয়া দেখে সবুজ। সবুজের চোখ জ্বলে, কিন্তু কাঁদতে পারে না। ও যে পুরুষ। বুক ফেটে চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চায়। নিজের স্ত্রীকে চোখের সামনে ধর্ষিত হতে দেখেছে ও। হাত-পা বাঁধা থাকায় কিছুই করতে পারে নি। অসভ্যদের কারাগার থেকে মীরুকে নিয়ে কিভাবে পালিয়ে এসেছে সেসব আর মনে করতে চায় না। ওদেরই লোকে বলে সভ্য সমাজ। যত্তসব বাজে কথা।

দশ-বারোজন যুবক। এদের কারো বাড়িতে বাবা-মা আছে, কারো আছে স্ত্রী-সন্তান। ঘর পেছনে ফেলে তারা বহুদূর উঠে এসেছে। নির্জন পাহাড়ের ওপর। আমেরিকার সৈন্যদের অপেক্ষায় ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। অন্ধকারেও ওদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে। আল্লাহর সাথে জান্নাতে করা প্রতিজ্ঞার কথা ওরা ভুলে যায়নি। সাদামাটা পোষাক, কিন্তু এক একজনকে দেখতে লাগে অসাধারণ। অন্তরের ঈমান চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসে। ওদের দু চোখ ভরা স্বপ্ন। কলুষতাহীন পবিত্র এক পৃথিবীর স্বপ্ন। ওরা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। শহীদি তামান্না নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন, হাসতে হাসতে মরণকূপে ঝাঁপ দেয়ার আকাঙ্ক্ষা। শত্রুরা ওদের ভয়ে অস্থির, ধাতব ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেঙে সেই ভয়ের গোঙ্গানি শোনা যায়। পরাজয় কী এই ছেলেগুলো জানেনা। ওরা জানে সন্তানহীন মায়ের প্রলাপ, ওরা জানে নিষ্পাপ বোনের ইজ্জত হারানোর কষ্ট, ওরা জানে পরিবার হারানোর বেদনা। ওরা মুহাজিদীন। ওরা ইসলামের সৈন্য। ওরা উম্মতের ভগ্ন শরীরের ইস্পাত কঠিন মনোবল। ওরা কালিমার কালো পতাকা নিয়ে এগিয়ে যায়, এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।

মজলুম মানুষগুলোর স্থানে কখনো কি নিজেকে রেখেছেন? ওদের চোখ দিয়ে দেখুন, ওদের কান দিয়ে শুনুন। ওদের অন্তরটা দিয়ে অনুভব করুন। সত্য বুঝতে পারবেন। ইতিহাস ৯/১১ এ শুরু হয়নি। ইতিহাসের সূচনা অনেক আগেই হয়ে গেছে, ইরাকে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে। মীরু, সবুজ, মুমিনা, হাসিব, প্রান্তের মতো না-জানা অনেক জীবনের ইতিহাস। হয়তো সেসব আপনার অজানাই রয়ে যাবে। হয়তো ওদেরকে খুনী তালেবান বলে আপনার সামনে সভ্য জগতের মিডিয়া হাজির করবে। হাজির করবে না পেছনের সত্যটুকু। না জেনে মিডিয়াকে বিশ্বাস করবেন না। যে মানুষগুলো নিজেদের রক্ষা করতে, মুসলিম ভাইবোনদের সম্ভ্রম রাখতে, পৃথিবীর বুকে ইসলামের ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্টা করতে জান বাজি রেখে লড়াই করে চলেছে একবার তাদের চোখ দিয়েও দুনিয়াটাকে অবলোকন করুন একবার সাহসী হোন একবার স্বপ্ন দেখুন। ইসলাম ও কুফুরের মাঝে চলমান সুদীর্ঘ এ লড়াইয়ে আপনার অবস্থানটা ন্যায়ের সাথে হোক।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহঃ এর ঐতিহাসিক কবিতা

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, মুজাহিদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. তার সমকালীন বিখ্যাত সূফী তাসাউফের ইমাম ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ. যিনি মক্কা-মদীনায় ইবাদত করার জন্য অবস্থান করছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু ঐতিহাসিক কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। তার কিছু কবিতা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا   لَعَلِمْتَ أَنَّكَ بِالْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

ওহে আবেদুল হারামাইন! (মক্কা-মদীনায় ইবাদতকারী!) নিশ্চয়ই তুমি মক্কা-মদীনায় ইবাদত করছো, এক রাকাতে লক্ষ রাকাতের সাওয়াব কামাচ্ছো, বায়তুল্লাহ তওয়াফ করছো, হাজরে আসওয়াদ চুমু খাচ্ছো, যমযমের পানি পান করছো, মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করছো, মূলতাযামকে জড়িয়ে চোখের পানি ঝড়াচ্ছো, এসবই অনেক ভাল কাজ। কিন্তু তুমি যদি আমাদের ইবাদত দেখতে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারতে যে, আমাদের ইবাদতের তুলনায় তোমার ইবাদত শিশুদের খেলনা ছাড়া কিছুই নয়।

কারণ ইহুদী-খ্রিষ্টান তথা গোটা কাফের শক্তিগুলো "আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা" অর্থাৎ 'ইসলামের বিরুদ্ধে সকল কাফের গোষ্ঠীগুলো এক' এর মূর্ত প্রতীক হয়ে মাঠে নেমেছে আর তুমি নির্জনে ইবাদতে মশগুল হয়ে আছো! যেই দ্বীন ক্বায়েম করতে গিয়ে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইনসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আজ সেই দ্বীন ধ্বংস হচ্ছে আর তুমি মক্কা-মদীনায় বসে বসে অজীফা আদায় করছো! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মক্কা থেকে হিজরত করে চলে গেলেন আর তুমি মক্কায় খানকা বানিয়েছো!

مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوْعِهِ   فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

তোমার এবং আমার ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তোমার যখন ইবাদত করতে করতে জযবা আসে তখন তোমার চোখের অশ্রু দিয়ে গাল ভিজে যায়। আর আমাদের যখন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে জযবা আসে তখন আমাদের গর্দানের রক্ত দিয়ে আমাদের গ্রীবা রঞ্জিত হয়ে যায়। তোমার চোখের পানির মর্যাদা আল্লাহর কাছে ঠিকই আছে তবে জান্নাতের কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু আমাদের রক্ত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

অর্থঃ 'আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার জীবন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তি যখম হয় (আল্লাহই ভালো জানেন কে আল্লাহর রাস্তায় যখম হলো) তবে কিয়ামতের দিবসে সে তার ঐ যখমগুলো নিয়ে উঠবে। তার রক্তের রঙ হবে যদিও রক্তের মত তবে ঘ্রাণ হবে মেশ্ক আম্বরের মত।' (সহীহ বুখারী ২৮০৩)

أَوْ مَنْ كَانَ يُتْعِبُ خَيْلَهُ فِيْ بَاطِلٍ   فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ

তোমাদের ঘোড়াগুলো তোমাদের হাদিয়া, তুহফা, আবা-কাবা, জুব্বা-ডিব্বা হরেক রকম খানা-পিনার বেহুদা বোঝা বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পরে। আর আমাদের ঘোড়াগুলো যুদ্ধের দিন ভোর বেলা (ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে) যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়।

رِيْحُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ، وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ

তুমি যখন ইবাদত করতে বস তখন মখমলের সাদা পাতলা ফিনফিনে জামা-কাপড় পরিধান করে দামি দামি আতর-গোলাপ, মেশ্‌ক আম্বরের সুগন্ধি ব্যবহার করে শান-শওকতে বস। অবশ্য আতর ব্যবহার করা ভাল আল্লাহর নবী এটা ভালবাসতেন এবং ব্যবহারও করতেন। কিন্তু এর ওপর জান্নাতের কোন গ্যারান্টি নেই। পক্ষান্তরে আমাদের আতর-গোলাপ সম্পর্কে জানতে চাও? প্রচন্ড যুদ্ধ চলাকালে ঘোড়ার পদাঘাতে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং যুদ্ধের ময়দানের ধুলা-বালুই আমাদের সুগন্ধি।

وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذَبُ

আর জেনে রাখ! আমাদের ধুলা-বালু সম্পর্কে আমাদের কাছে নবীজির সত্য সঠিক বাণী এসেছে যা কখনো মিথ্যা হওয়ার নয়। আর তা হচ্ছে :

لَا يَسْتَوِىْ غُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِىْ أَنْفِ اِمْرَىٍٔ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ

যুদ্ধের ময়দানের ধুলা-বালু ও জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনের ধোঁয়া কোন ব্যক্তির নাকে একত্রিত হবে না। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে যাদের নাকে ধুলা-বালূ লেগেছে তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না। এ কথাটি হুবহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا

অর্থ: 'আবু হুরাইরা রাযি.থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর রাস্তার ধুলা-বালু এবং জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনের ধোঁয়া কোন ব্যক্তির পেটে কখনো একত্রিত হবে না।' (সুনানে নসায়ী ৩১১০; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৭৪)

هَذَا كَتَابُ اللهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيْتٍ لَا يُكْذَبُ

জেনে রাখ! তুমি যতবড় বুজুর্গই হও না কেন তোমার মৃত্যুর পরে তোমার দামি কাপড়-চোপড় খুলে ফেলা হবে, কেননা তুমি মরে গেছো। আর আমি যদি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যাই আমার কাপড়-চোপড় খোলা হবে না। ঐ রক্ত মাখা কাপড়-চোপড় দিয়েই দাফন করা হবে, কেননা আমি জীবিত। তুমি যখন মারা যাবে তোমার জানাযায় লক্ষ লক্ষ মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ জমা হবে কেননা তুমি জগত বিখ্যাত পীর ও বুজুর্গ। আর আমার জানাযায় হয়তো কোন লোক আসবে না কেননা আমি শহীদ। জানাযার সময়ও হামলা হওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু জেনে রাখ! তোমার জানাযায় লোকের প্রয়োজন আছে, কেননা তুমি মৃত। আর আমার জানাযায় লোকের প্রয়োজন নেই, কেননা আমি শহীদ। আমাকে আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) জীবিত বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

অর্থ: 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।' (সুরা বাক্বারা, আয়াত ১৫৪)

ফুযাইল ইবনে আয়ায এর নিকট কাবার কাছে অবস্থানরত অবস্থায় যখন এই চিঠি পৌছলো তখন তিনি এই চিঠি পড়ে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় বললেন, আবু আব্দুর রহমান ইবনে মুবারক ঠিকই বলেছে এবং আমাকে সৎ উপদেশ দিয়েছে।

এক ফিলিস্তিনি বন্ধুর বার্তা

আবু আব্দুল্লাহ

আমার এক বন্ধু ছিল। সে ছিল ফিলিস্তিনের গাজার অধিবাসী। থাকত দুবাই। প্রায় সময় তার সাথে চ্যাটে আলাপ হতো। কয়েক মাস হল সে ফেসবুক ত্যাগ করেছে। গেল বছর সে একদিন আমার কাছে একটি মেসেজ পাঠাল।

'আমি যখন খুব ছোট্ট ছিলাম, তখন জুমআর খতীব দুআয় বলতেন, হে আল্লাহ, তুমি বসনিয়া ও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের সাহায্য করো !

যখন একটু বড় হলাম, তখন জুমআর খতিব দুআয় বলতেন হে আল্লাহ, তুমি বসনিয়া , ফিলিস্তিন ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের সাহায্য করো !

যখন আরেকটু বড় হলাম, তখন জুমআর খতীব দুআয় বলতেন, হে আল্লাহ, তুমি বসনিয়া, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া ও আফগানিস্তানের মুসলমানদেও সাহায্য করো !

যখন আরেকটু বড় হলাম, তখন জুমআর খতীব দুআয় বলতেন, হে আল্লাহ, তুমি ফিলিস্তিন , চেচনিয়া, সোমালিয়া ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের সাহায্য করো !

যখন আরেকটু বড় হলাম, তখন জুমআর খতীব দুআয় বলতেন, হে আল্লাহ , তুমি ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ইরাক, সোমালিয়া ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের সাহায্য করো !

যখন আরেকটু বড় হলাম তখন জুমআর খতীব দুআয় বলতেন, হে আল্লাহ, তুমি ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বার্মা, সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের সাহায্য করো !

আর (গত বছর) তিনি দুআয় বলছেন, হে আল্লাহ , তুমি ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বার্মা সোমালিয়া ,সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের সাহায্য করো ...'

আর এখন(এক বছর পর বর্তমানে) আমরা বলছি,

হে আল্লাহ, তুমি মধ্য আফ্রিকা, মিশর, বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বার্মা ,সোমালিয়া , সিরিয়া, ইয়েমেন, ভারত, ইরাক ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের সাহায্য করো...এভাবে আর কতোদিন কত মুসলিমদেশকে যোগ করব ...?

হৃদয়ের আকুতি

হাসান তারেক

সীমান্তের উঁচু উঁচু দেয়ালগুলো হয়তো ওই পারের নির্যাতিত ভাইদের চিৎকার তোমাদের কর্ণকুহরে পৌঁছতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়!

সাগরের বিশাল ঢেউয়ের জোরালো শব্দ হয়তো সাগরের ঐ পাড়ের মুসলিম মায়েদের কান্নার আওয়াজ তোমারে কানে পৌঁছানোর পুর্বেই মিলিয়ে যায়।

কাঁটা তারের দেয়ালগুলো হয়তো তোমাদের আত্মাকে পেচিয়ে রেখেছে তাই তোমাদের ভাইদের চিৎকার তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না।

তাই বলে ভেবনা যে, কারো কানেই এই মর্ম বেদনার আওয়াজ ঢুকেনা। কারো হৃদয়েই তা শেল বিদ্ধ করে না। এক দল মুসলিম আজো আছে যাদের বোনদের কান্নার পানি পৃথিবীর বুকে যেখানেই পড়ুক তাদের বুকে তা সমুদ্র ঝড় বইয়ে দেয়। তাদের মায়েদের আর্তনাদ তাদের অন্তরকে চুরমার করে দেয়। তাদের ভাইদের চিৎকার তাদেরকে পৃথিবীর তাবৎ জালেমদের বিরুদ্ধে বুক টান করে দাঁড়াতে শেখায়।

আল্লাহ্ আমাদের সেই ভাইদের দলভুক্ত করে দিন। আমীন।



চশমার আয়নায় যেমন

শমসের আলী

আমাদের সমাজে কিছুলোক আছেন, যারা প্রতিটি কাজ ভিন্ন চোখে দেখেন। যারা মনে করেন, এমন কাজ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিৎ, যার দ্বারা আমাদের কষ্ট বেড়ে যায়। কোনো ধরনের বিপদ আসাকেই উনারা ইসলামের পরাজয় মনে করেন। মনে করেন, এইতো শত্রু আসার পথ খুলে দেওয়া হলো!! জানি না কোন দৃষ্টি নিয়ে উনারা এ কথা বলেন। যদি ইসলামের আলোকে একথা বলেন, তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মক্কার কাফেররা কোনোদিনই মদীনায় হামলা করেনি। কিন্তু যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বণিক কাফেলায় আক্রমণের জন্যে বের হলেন, তখন মক্কার কাফেররা পূর্ণ রণসজ্জা নিয়ে বের হয়। আচ্ছা বলুনতো, তখন যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না বের হতেন, তাহলে কি বদর যুদ্ধ হতো? আর বদর না হলে কি উহুদে রাসূলের দাঁত মুবারক শহীদ হতো? তাহলে এই কাফেরদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার পিছনে কার অবদান?

১৮৫৭ সালে আযাদী লড়াইয়ে হাজার হাজার আলেম শহীদ হন, সহস্রাধিক মাদ্রাসা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ ছিলো আযাদীর লড়াইয়ে উনাদের অংশগ্রহণ। উনারা যদি স্যার সায়্যিদ আহমদের মতো ইংরেজদের তোষামোদী করতেন তাহলে এই ভয়াবহ নির্যাতন আসতো না। স্যারই উপাধি পেতেন। তাহলে এটাও কি ভুল ছিলো?

ভাবটা হলো এমন যে, শত্রু আমাদের ঘরে এসে আমার সবকিছু লুট করে নিয়ে যাবে; কিন্তু আমি এজন্য প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করবো না যে, এর দ্বারা আরো শত্রু আসবে। ওরা এসে স্ত্রী-বোনদের সম্ভ্রমহানি করবে কিন্তু আমি এজন্য মুখ খুলবো না, কারণ ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে। বাহ!! দারুন তো... আমরা এমন নীরব থাকবো যে, এক পর্যায়ে আমাদের দেশের ইমামদের রাস্তায় নামিয়ে চীনের মতো নাচাবে, তবুও কিছু বলবো না, কারণ শত্রু আসার পথ খুলে যাবে! আসলেই ইসলাম পাওয়া খুব সহজ এজন্যেই তো আল্লাহ বলেছেন,

﴿ الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) ﴾

‘আলিফ-লাম-মীম, মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।’ (সূরা-আনকাবুত, আয়াত ১-৩)

বিয়ে কোন বয়সে করা ভালো?

-আবু তাসমিয়াহ

একটা কথা শুনেছিলাম সেদিন। পশ্চিমা এক দেশে একবার একটি কুকুর একটি বাচ্চাকে আক্রমণ করে। চারিদিকে লোকজন দাঁড়িয়ে দেখছিলো। কেউ এগিয়ে আসছিলো না তাকে সাহায্য করতে। একজন মানুষ সাহস করে এগিয়ে গিয়ে কুকুরটিকে মেরে বাচ্চাটিকে বাঁচায়। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে তার এই সাহসী ভুমিকার। লোকজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাংবাদিকরা এলো তার সাক্ষাৎকার নিতে। জিজ্ঞাসা করলো আপনার নাম কী? সে বললো, মুহাম্মাদ। বিস্তারিত সাক্ষাৎকার সবাই নিয়ে গেলো ঠিকই। কিন্তু পরের দিন পত্রিকায় এলো, 'মুসলমান সন্ত্রাসীর হাতে নিরীহ কুকুর নিহত'।

ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিধর্মী ও সেক্যুলাররা কখনো কোনো নীতি-নৈতিকতা ও সততার তোয়াক্কা করে না। সব সময়ই ডার্টি গেইম প্লে করে। এমনকি আল্লাহর নবী নূহ আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত কাউকেই এরা ছাড় দেয়নি। কারণ, এদের নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। সেটা হোক বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা। সকল ক্ষেত্রেই।

সমাজের যা কিছু খারাপ কিংবা যা কিছুকে তারা 'খারাপ সাজাতে' চায় সব কিছুকে তারা ইসলামের সাথে ট্যাগ করে দেয়। এতে তাদের ফায়দা হলো, অসচেতন মানুষের মধ্যে একটা অবচেতন ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব তৈরি হয়।

কিছু দিন আগে একটা নিউজ পড়েছিলাম। এক ছেলেকে তার এক বন্ধু তার বাবার রেখে যাওয়া ১৪ লাখ টাকা ফু দিয়ে দ্বিগুণ করার লোভ দেখায়। সে জানায়, তার পরিচিত এক পীর/ফকীর আছে, সে নাকি ফুঁ দিলেই টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়। টাকা দ্বিগুণ করতে বন্ধুকে নিয়ে রওয়ানা হয় ফকীরের বাড়ি। সে আর ফিরে আসেনি টাকা নিয়ে। ফিরেছে তার লাশ। এই সংবাদের কমেন্টে দেখলাম একজন লিখেছে, 'ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষকে কতো অন্ধ বানিয়ে দিতে পারে!

ডার্টি গেইমের এটাই হলো তাদের লাভ। ঘটনাটি ঘটার পেছনে যেখানে একমাত্র কারণই হলো ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুপস্থিতি; সেখানে গোটা দায়ভারটাই চাপানো হলো ধর্মের ঘাড়ে।

এমন আরো কতো নিউজ দেখবেন, 'প্রেমের কারণে যুবতীকে ৮০ দোররা' ইত্যাদি। খবর নিয়ে হয়তো দেখা যাবে ঘটনা শুধু প্রেমেই নয়, প্রেম হয়তো শরীরেও গড়িয়েছিলো। এরপর গ্রামের মাতব্বররা হয়তো এই কাজ করেছে। পিটুনি দেওয়াটাকে বলা হবে দোররা। আর কয়টি পিটুনি হয়েছিলো সেটা কে-ইবা জানে। বলা হবে ৮০ দোররা। কারণ শরীয়াহ আইনে ৮০ দোররার একটা ব্যাপার আছে। ঘৃণা জন্মানো হবে ৮০ দোররার প্রতি। সহানুভূতি জন্মানো হবে অবৈধ প্রেমের প্রতি। চেপে যাওয়া হবে তাদের শরীর তত্ত্বের আসল ঘটনা। যদিও এখানে মাতব্বররা যা করেছে, যেভাবে করেছে, তার সাথে হয়তো ইসলামী আইনের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

খবরে দেখা যাবে, 'বিধবাকে জোর করে হিল্লা বিয়ে দেওয়া হয়েছে'। খবরটা এমনভাবে পরিবেশন করা হবে, যেন হিল্লা বিবাহ ইসলামী বিধানের একটি অংশ। অথচ ইসলামের ব্যাপারে নূন্যতম জ্ঞান রাখলেও জানার কথা যে, এর সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

এমনই তথ্য সন্ত্রাসের শিকার একটি বিষয় হলো রাষ্ট্রের নির্ধারিত বয়স হওয়ার আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'বাল্য বিবাহ'। শব্দটা দিয়েই একটা অপরাধের আবহ তৈরি করা হয়েছে। এরপর নানা রকম শ্লোগান তৈরি করা হয়েছে। কুড়িতে বুড়ি নয়, বিশের আগে বিয়ে নয়। আরো কতো কী। এর তথাকথিত ক্ষতিকারক দিক নিয়ে নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ে কী কী শারীরিক জটিলতা তৈরি করে তার ফর্দ বানানো হয়েছে। অথচ দেরিতে বিয়ের কারণে যে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে হাজারো মানুষ তা নিয়ে কিন্তু এরা কখনো কিছু বলবে না। কারণ এটা বললে তাদের নোংরা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

অল্প বয়সে বিয়েকে মাতৃ-মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অথচ একটি মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে যে বায়োলজিক্যালী সে গর্ভধারণের জন্য সম্পুর্ণ উপযুক্ত এটা সায়েন্টিফিকভাবে প্রমাণিত। মাতৃ-মৃত্যু যদি হয়ে থাকে সেটা অবশ্যই অন্য কোনো কারণে। হতে পারে সেটা

অযত্ন অবহেলা, পুষ্টিহীনতা, যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়া ইত্যাদি। এসবের কারণে তো খোদ বিয়েকে দায়ী করার কোনো যৌক্তিকতা নেই! এ ধরণের বায়াস কাজ অনেকেই করে। যেমন তামাকমুক্ত সমাজ গড়া নিয়ে যারা কাজ করে তারা সিগারেটের কারণে মৃত্যুর হারকে এমনভাবে দেখায়, যা সত্যিই আশংকাজনক। অথচ রিসার্চ করলে হয়তো দেখা যাবে, তাদের দেখানো মৃত মানুষগুলো সিগারেট হয়তো খেতো ঠিকই, কিন্তু সিগারেটের কারণেই যে তারা মারা গেছে তা কিছুতেই প্রমাণিত নয়।

এরা অল্প বয়সে বিয়েকে একটা জঘন্য নোংরা কাজ হিসেবে উপস্থাপন করে। এরপর এর দায়ভার ইসলামের ওপর চাপায়। এটাকে প্রমাণ করার জন্য আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সা. এর সাথে আয়েশা রাযি. এর বিয়ের ব্যাপারটিকে উদ্দ্যেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিয়ে, এই বিংশ শতাব্দিতে আবিস্কৃত কোনো রীতি নয়। পৃথিবীর প্রথম মানবজুটি থেকে নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে এ রীতি চালু আছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। আর সৃষ্টিগত ও চাওয়া-পাওয়ার দিক থেকে মৌলিকভাবে মানুষের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। পৃথিবীর প্রথম মানুষের শারীরিক গঠন যেমন ছিলো, এখনো মানুষের গঠন তেমনই আছে। মৌলিকভাবে চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনার কারণ ও কার্যকারণও একই রকম আছে। কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অতএব বিয়ে এমন কোনো বিষয় নয়, যাকে আমাদের নতুনভাবে মুল্যায়নের কিছু আছে। আদম আ. এর সন্তান-সন্ততিরা হাওয়া আ. এর গর্ভে যেভাবে এসেছিলো আপনি আমিও সেভাবেই এসেছি। আমাদের সন্তানরাও সেভাবেই আসে।

ঐতিহাসিকভাবেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বয়সের ব্যাপারটি স্থানীয় রীতি-নীতি ও সামাজিক কালচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। উইকিপিডিয়ার দেওয়া তথ্যমতে প্রাচীন রোমান সমাজেও বিয়ের কোনো নির্ধারিত বয়স ছিলোনা। সাধারণতঃ বয়প্রাপ্ত হওয়া বা পিরিয়ড শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো এবং তারা সে বয়সেই বাচ্চা জন্ম দিতো।

বর্তমান আধুনিক ইউরোপের সবগুলো দেশেই বিয়ের উপযুক্ততার ক্ষেত্রে ছেলেদের বয়স হলো আঠারো; স্কটল্যান্ডে তো মাত্র ষোল। অন্যদিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ দেশেই ষোল; কোনো দেশে পনের ও সতেরও রয়েছে। কেউ চাইলে কোর্ট আরও কম বয়সেও অনুমতি দিয়ে থাকে। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে একমাত্র মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশেই ছেলেদের ২১ ও মেয়েদের ১৮ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মালয়েশিয়াতে মুসলিমরা শরীয়া কোর্টের অনুমতি নিয়ে এর নিচের যে কোনো বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। আমার জানামতে একমাত্র বাংলাদেশেই বয়সের এই আইন ভঙ্গ করাকে ক্রিমিনাল অ্যাক্ট বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়।

সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে ইয়েমেন। দীর্ঘদিন সেক্যুলাররা শাসন ক্ষমতায় থাকলেও এক্ষেত্রে তারা সাধারণ জনগণের ওপর কোনো বিধান চাপিয়ে দেওয়ার সাহস পায়নি। সে দেশে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধে মতো সময়ে বিয়ে করার। আসলেই ইয়েমেনীরা ভাগ্যবান। আল্লাহর রাসূলের কথা শাশ্বত সত্য। তারা সভ্য, তাদের হৃদয় নরম; দীন ইয়েমেনে, প্রজ্ঞাও ইয়েমেনীদের মধ্যে। আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য এই ইয়েমেন থেকেই ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীর আবির্ভাব ঘটবে।

যোগাযোগব্যবস্থা, তথ্য প্রযুক্তিসহ নানা বৈষয়িক এককে আমরা কিছুটা উন্নতি সাধন করেছি সত্য; কিন্তু সমাজের, বিশেষ করে যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এটা কেউই অস্বীকার করে না। একমাত্র হলুদ আলোর সমর্থকেরা ছাড়া। সবাই-ই স্বীকার করেন যে, নৈতিক দিক থেকে আমাদের বাপ-দাদাদের যুগ আমাদের এই যুগের চেয়ে অনেক ভালো ছিলো। অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব এতো মারাত্মক তখন ছিলো না। সেই সমাজের বিয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের পল্লী কবি। তিনি লিখেছেন,

ঐখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। এতোটুকু
তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ
পুতুলের বিয়ে ভেঙ্গে গেল বলে কেদে ভাসাইতো বুক

এখানে পুতুল খেলার বয়সে বিয়ের মধ্যে আমাদের দুমুখো প্রগতিশীলেরা নান্দনিকতা খুজে পেলেও, আয়েশা রাযি. এর পুতুল খেলার বয়সে বিয়ের মধ্যে তারা ঠিকই ধর্মান্ধতা ও ভয়ংকর অমানবিকতার গন্ধ খুজে পান! এসব প্রগতিশীলদের ব্যাপারে মন্তব্য করতেও রুচিতে বাধে। বিচারের দায়িত্ব পাঠকদের ওপরই ছাড়লাম।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে তার বিপরিত লিঙ্গের প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। একের জন্য অন্যের সান্নিধ্যের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন। আর এই সান্নিধ্য প্রাপ্তির আইনগত, ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মের নাম হলো বিয়ে। ইসলামে বিয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। নারীরও নয়, পুরুষেরও নয়। পুরুষের বয়স বেশী হবে না নারীর? তা নিয়েও কিছু বলেনি। এটা মানুষের স্থান-কাল-পাত্র, পরিবেশ-প্রতিবেশ, মন-মনন, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও

রুচিবোধের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ইসলাম যেহেতু গোটা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর দেওয়া ধর্ম। তাই মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা বা ফিতরাতের দাবীকে কখনো উপেক্ষা করেনি। কোনো রকম ভান-ভনিতা, লৌকিকতা ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি।

মানুষের স্বভাবজাত কোনো প্রবণতাকে যদি কোনোভাবে দমিয়ে রাখার অপচেষ্টা করা হয়, তখন ব্যাক-ফায়ার অনিবার্য। পানির স্বাভাবিক স্রোত যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে সে নিশ্চয়ই বিকল্প পথ বের করে নিবে। আপনারা যারা গ্রামে-গঞ্জে গিয়েছেন তারা হয়তো একটি ব্যাপার দেখে থাকবেন। বদ্ধ পুকুর বা জলাশয়ে পানি আসা-যাওয়ার যদি নালা না থাকে তাহলে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি হয় পানির নিকটতম স্রোতধারার সাথে। যেটাকে আমাদের অঞ্চলে বলা হয় 'হাইত্তা'।

২১ ও ১৮ বছর পর্যন্ত বিয়ে নিষিদ্ধ করে যে স্বাভাবিক স্রোতকে বন্ধ করা হয়েছে, তার বিকল্প 'হাইত্তা' আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। ডাস্টবিন থেকে নবজাতক উদ্ধার। অমুক অমুক এলাকায় রমরমা দেহ ব্যবসা। এক দড়িতে ঝুলে প্রেমিক যুগলের আত্মহত্যা। পত্রিকার পাতায় স্থান না পেলেও আপনি, হ্যা, আপনিও এমন অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী। নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী আপনি নিজেই। আমাকে এর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না।

যে সমাজে নাটক-ছিনেমা, গল্প-উপন্যাসে, রেডিও-টিভি-বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপনে সারাক্ষণ মানুষকে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়। যে সমাজে পর্ণছবি বাজারের আলু-পটলের মতো বিক্রি হয়; যে সমাজে অনলাইনে নোংরামী মাত্র একটি ক্লিকের মধ্যে সহজলভ্য করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে সহজাত চাহিদা পুরণের বৈধ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেখানে পরিস্থিতি কেমন রুপ ধারণ করতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা এখনও টের পাননি, একটু অপেক্ষা করুন। আমাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। আপনিই টের পাবেন হাড়ে হাড়ে। আপনার কলিজার টুকরা কন্যা, প্রাণপ্রিয় ছেলেই আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল করিয়ে দেবে।

সত্যিই ভাবনার বিষয়! যেখানে ১৮ বছর বয়সে একজন মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মতো জনগুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য ভোট দেওয়ার উপযুক্ত হয়; সেখানে তাকে বিয়ের মতো একটা একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয় 'তুমি অনুপযুক্ত'। বিচিত্র! সত্যিই বিচিত্র!!

বিয়ে-শাদী দেরিতে হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে বাস্তববাদিতা, দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্কতারও মারাত্মক অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ছ্যাবলামোর প্রভাব সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয়। এমন দৃশ্য আপনাদের চারপাশে অহরহ দেখে থাকবেন যে, ২৫-২৬ বছরের এক শক্ত সামর্থ্য যুবক বাপের হোটেলে খায় আর আড্ডাবাজি করে বেড়ায়। সমাজে কোনো অবদান তো রাখেই না, কারো দায়িত্ব তো নেয়ার মুরোদই নাই; বরং সে নিজেই সমাজের জন্য একটা বোঝা, একটা অভিশাপ।

রেস্পন্সিবিলিটি ছেলেদেরকে 'পুরুষ' বানায়। শুধু প্যান্ট পরা অর্থে পুরুষ নয়, বাস্তব অর্থে। তার চিন্তা-চেতনায় ও আচার আচরণেও তা ফুটে ওঠে। কথায়ও বলে, A man is not MAN until he takes the responsibilities of others. পুরুষ ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ হয় না, যতক্ষণ না সে অন্যের দায়িত্ব ঘাড়ে না নেয়। আর এটা যতো তাড়াতাড়ি হবে, সমাজ জীবনেও ততো তাড়াতাড়ি দায়িত্বশীলতার প্রভাব পড়বে।

ইসলাম বিয়ের কোনো বয়স নির্ধারণ না করলেও নীতিগতভাবে প্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলে-মেয়েদেরকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র ও দায়িত্বশীল জীবন যাপনে উৎসাহ দেয়। অতএব আমরাও আমাদের স্রষ্টার নির্দেশনা মানতে চাই। আমাদের অধিকার ফেরৎ চাই। আমরা চাই, আমাদের ছোট ভাই-বোনেরা, ছেলে-মেয়েরা ছাড়া গরু ছাগলের মতো এ ক্ষেতে সে ক্ষেতে মুখ দিয়ে না বেড়াক; তারা দায়িত্বশীল হোক, তাদের মানসিক স্থিতিশীলতা আসুক; তারা পৃথিবীতে অধিক প্রোডাকটিভ ও মেচিউরড ভুমিকা পালন করুক। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য উপলব্ধির তাওফিক দান করুন। আমীন! আমীন!! আমীন!!!



হে নারী! একটু দাঁড়াও, দু'টি কথা শুনে যাও

সানজিদা শারমিন

একটা পাখি, যে স্বাধীনভাবে আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে ভালোবাসে, ভালো-মন্দ যা খেয়েই থাকুক না কেন, তার আনন্দের সীমা নেই। যত ভালো খাবারই দেওয়া হোক না কেন, তার সাথে কি খাঁচার পাখির তুলনা চলে?

আবার গৃহপালিত পশুপাখিকে জঙ্গলের প্রতিকুল পরিবেশে ছেড়ে দিলে, স্বাধীনতা যতই থাকুক না কেন হিংস্র পশুর হাতে ওদের অকাল মৃত্যু নিশ্চিত। আসলে প্রতিটি প্রাণীকেই একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্যই একটা উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র আছে।

নারী পুরুষের ব্যাপারটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এদেরও প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও চরিত্র বৈশিষ্ট এবং রয়েছে তার জন্য উপযুক্ত দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র; কিন্তু নির্মম হলেও সত্য যে, এ যুগে নারীদেরকে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে বের করে আনা হয়েছে।

স্বাধীনতা, অর্থ ও সম্মানের লোভ দেখিয়ে নারীদেরকে তাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যে ঘর তাদের সুখের নীড়, নিরাপদ আশ্রয়স্থল সেখানে অবস্থান করাটাকে বলা হচ্ছে পশ্চাতপদতা। তাদেরকে শেখানো হচ্ছে যে, তাদেরকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, পুরুষের সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারাটাই যেন নারী জীবনের সার্থকতা। অথচ নারীদের কর্মক্ষমতা ও মানসিক শক্তি ও প্রকৃতি মোটেই পুরুষের মতো নয়।

সন্তান প্রতিপালন ও ঘরকন্না করা কোনো পুরুষের কাজ নয়। তবে একজন ভালো মুসলিম স্বামী অবশ্যই তার স্ত্রীকে ঘরের কাজে সাহায্য করবে। কারণ এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ। ঠিক তেমনি ঘরের বাইরের অফিস আদালতের কাজগুলোও নারীর নয়। তবে স্বামীর অনুমতিতে একজন নারী চাইলে এমন কোনো কাজ করতে পারে যা শরী'আহ বিরোধী নয় এবং তার মূল দায়িত্ব পালনে কোনো সমস্যা তৈরি করে না।

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির স্রষ্টা। তিনি নারী-পুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই নারীদের প্রকৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি তার অশেষ রহমতের কারণে নারীদেরকে কোনো অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব দেননি। একজন নারী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কারও না কারও তত্ত্বাবধানে থাকবে, যে তার ভরণপোষণসহ নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে নৈতিক ও আইনগতভাবে বাধ্য থাকবে। এটাই শান্তির ধর্ম ইসলামের বিধান।

মানুষ হিসেবে একজন নারীর সার্থকতা আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠা বান্দা হওয়ায়। আর নারী হিসেবে একজন নারীর সার্থকতা হলো একজন ভালো স্ত্রী ও একজন সার্থক মা হওয়ায়।

কুরআন ও সুন্নাহর অনেক জায়গায় স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর অনুগত্য করা মানে নিজেকে ছোট করা নয়। এক রাজ্যে দুই রাজা থাকলে কখনো শান্তি থাকে না। একটি দেশের শান্তি বজায় রাখতে কাউকে কর্তৃত্বের অবস্থানে থাকতে হয় আর অন্যদের তার অনুগত হতে হয়। সংসার রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়।

যেহেতু অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন, তাই পরিবারের কর্তৃত্বও দিয়েছেন তাদেরকে। তবে এতে আল্লাহর কাছে নারীদের মর্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। আমরা সবাই আল্লাহর রাসূলের সেই সুপরিচিত হাদিসটি জানি, যেখানে একজন মাকে সন্তানের সাহচর্য তিনভাগ দেওয়া হয়েছে, আর বাবাকে দেওয়া হয়েছে একভাগ।

একটা বিষয় আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল মর্যাদার সাথেই দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্ধ। যেক্ষেত্রে যাকে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে তার দায়িত্বও বেশি। মায়ের এই মর্যাদার কারণে সন্তানদের মানুষ করে তোলার জন্য তার ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দায়িত্বও অধিক।

যে যাই বলুক না কেন, নারীদের ঘরের কাজ কোনো অংশেই পুরুষদের কাজের তুলনায় কম বা সহজ নয়। তাই একজন নারী যখন একসাথে ঘরের আর বাইরের কাজের বোঝা নিজের কাধে তুলে নেয়, তখন কোনোটাই ভালমতো সামলাতে পারে না।

পরের চাকুরীতে যদিও গাফলতি করার সুযোগ নেই, তবুও একজন মায়ের মন ঠিকই সন্তানের কাছে পড়ে থাকে। অনেক কর্মজীবী নারীদের কণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস শুনেছি। তাদের মনটা ব্যথিত হয়, কিন্তু করার কিছুই নেই, সমাজ-সংসার তার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিয়েছে অর্থনৈতিক

দায়িত্বের বোঝা। ওদিকে কাজের বুয়ার কাছে ছোট্ট শিশুটা কত কষ্টেই না লালিত হচ্ছে! মাকে কাছে চায়, কিন্তু পায় না। এ কষ্ট যে কতো নির্মম, এটা একটা শিশুকে যে কতোটা অ্যাবনর্ম্যাল করে তোলে তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে।

অন্য দিকে স্বামী যখন অফিস থেকে ফেরে স্ত্রীও হয়তো তখনই ফেরে। দুজনই ক্লান্ত। এরপর যখন স্বামী বসে বসে টিভি দেখে আর সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকা স্ত্রীর উপর তার স্বভাবসুলভ কর্তৃত্ব জাহির করে তখনই শুরু হয় দন্দ্ব কলহ। নানারকম পারিবারিক অশান্তি। সত্যি বলতে, এটাই কর্মজীবী দম্পতিদের জীবনের নিত্য দিনের স্বাভাবিক চিত্র। একে কি আপনারা নারী স্বাধীনতা বলবেন? একেই আপনারা প্রগতিশিলতা বলবেন? নারীকে কি পুরুষ বানানো যায়? মায়ের মন থেকে কি সন্তানের ভালোবাসা দূর করা যায়?

একটা মেয়ে শিশুকে যদিও বাবা-মা ছেলে শিশুটির মতোই আদর-যত্নে বড় করে তোলেন; কিন্তু আমাদের সমাজের অনেক বাবা-মা-ই ছেলে আর মেয়ে সন্তানের পার্থক্য ভুলে যান। অনেক বোনদের মুখে শুনেছি যে, তাদের বাবা বা ভাই তাদের ব্যয়ভার বহন করতে চান না। স্পষ্টভাবে বা আকার ইঙ্গিতে নানাভাবে বুঝিয়ে দেন। চাকুরী না করার কারণে তাদেরকে কটূক্তি শুনতে হয়। পৌরুষত্বহীন অনেক স্বামীরাও তাদের স্ত্রীর সাথে একই রকম আচরণ করে।

আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, মেয়েরা শুধু বসে বসে খায়, তবে আপনাদের কাছে আর কিছু ব্যাখ্যা করার নেই। তবে জন্মের পর থেকে দেখছি, ভোর ফজরের আজান থেকে আমাদের মা-খালাদের কাজ শুরু করতে হয়। ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কাজ করতে থাকেন ক্লান্তি শ্রান্তিহীন। বিছানায় শুয়ে শুয়েও চিন্তা করেন পরদিন কী রান্না হবে, কে কখন বাসা থেকে বের হবে ইত্যাদি। তারপরও যদি আপনাদের মনে হয় নারীরা শুধু বসেই থাকে, তাহলে মনে করুন যে, আল্লাহ তাদেরকে বসে বসে খাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের আর কিচ্ছু বলার নেই।

অনেকে বলে, লেখা পড়া করে শিক্ষিত হয়ে কি বাড়িতে চাকরের কাজ করব নাকি? তাদেরকে বলবো, সত্যিকার এবং আক্ষরিক অর্থে নিকৃষ্ট চাকর তো তারাই যারা নিছক ক'টা পয়সার জন্য, নিছক বস্তুবাদী লোভ লালসা পূরণের জন্য অফিসের বসদের কথায় উঠ-বস করে, তাদের হুজুর হুজুর করে। বাইরের মানুষের ইচ্ছার গোলামীতে নিজেকে নিয়োজিত করাই তো চাকরের কাজ। নিজের স্বামী-সন্তানের সেবা যত্ন করা কি কখনো চাকরের কাজ হতে পারে?

আপনি বলুন, আপনার স্বামী সন্তানের সেবা করলে তারা আপনাকে যে ভালোবাসা দেবে, যে সম্মান ও মর্যাদা দেবে, যে নিরাপত্তা ও আস্থা দেবে তা কি কখনো আপনাদের বসরা আপনাদেরকে দেবে? কক্ষনো না। তারা শুধু চেষ্টা করবে আপনাদেরকে নিংড়ে কতোটা বেশি লাভবান হওয়া যায় তার। আর তাদের ভিন্ন রকম 'নিংড়ানোর' গল্প না হয় আমি আর না-ই তুললাম এখানে।

আপনারা কি লক্ষ্য করেন না, পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে? তারা তাবৎ দুনিয়া জুড়ে নারী স্বাধীনতা ফেরী করে বেড়ায়, অথচ সেখানে নারীদের পারিবারিক কোনো মর্যাদা নেই। শান্তি তো সে বহু দিন আগেরই হারানো সুখ পাখী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় তাদের মধ্যে পরস্পরের উপর কোনো নির্ভরশীলতা নেই। স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের আনুগত্য করতে নারাজ। পরিণতিতে সেখানে পারিবারিক অশান্তি ও বিবাহ বিচ্ছেদের হার ভয়ানক উদ্বেকজনক! মানুষের নীতি নৈতিকতার কোনো বালাই নেই! কারণ, সেখানে পারিবারিক বন্ধন মজবুত নয়। মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রথম শিক্ষিকা নন। মায়ের আদর স্নেহ থেকে সন্তানরা বঞ্চিত। তারা বেড়ে ওঠে 'ডে-কেয়ার' সেন্টারে। আর এর 'উত্তম প্রতিদান স্বরূপ' এই সন্তানরা বড় হয়ে বৃদ্ধ বাবা-মাকে ফেলে আসে ওল্ড হোমে।

এই সব কিছুই নারীদেরকে তাদের প্রকৃত অবস্থান থেকে বের করে আনার কুফল। তাদের আসল কাজ ফেলে ভোগবাদী মোহের পেছনে ছুটে বেড়ানোর পরিণাম। ভেবে দেখুন, আপনারা যে নারী জাগরণ, প্রগতিশীলতা ও নারী স্বাধীনতার স্তুতি করেন, এটাই কি তার শেষ পরিণতি নয়?

কেবল অন্ধের মতো না ছুটে আমাদের একটু থেমে চিন্তা করা উচিত যে, আমরা কোন্ দিকে ছুটছি? সেখানে কি আমাদের পার্থিব সুখ শান্তি নিহিত আছে? না পরকালীন মুক্তি আছে?

প্রিয় বোন : আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন আমাদের পত্রিকায়
লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
muftihasanimtiaz@yahoo.com

'হাশরের ময়দানে দেখা হবে'

বলে বাসর রাতে স্ত্রী থেকে বিদায় নেবার গল্প।

আনিকা ওয়ারদা তুবা

সাহাবা রাযি. দের কাহিনী পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকি... কী ছিল তাদের ভালোবাসা আল্লাহর রাসূল সা. আর ইসলামের জন্যে! আর কোথায় আমরা? নিজের শরীরটাকে দুঃখে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ইচ্ছা করে! ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের মত করে আত্মত্যাগ করার তওফিক দাও, আমীন!

সা'দ আল আসওয়াদ আস-সুলুমী (রা)-এর কথা কি আপনারা জানেন?

নামটাও হয়তো অনেকে শুনেনি কোনদিন। তাঁর সমাজে হাই-স্ট্যাটাস ছিল না, তিনি ছিলেন গরীব, গায়ের রঙ কালো। কেউ তাঁর কাছে নিজের মেয়েও বিয়ে দিতে চাইতো না।

সা'দ রাযি. একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও কি জান্নাতে যাবো?'

'আমি তো নীচু মাপের ঈমানদার হিসেবে বিবেচিত হই'

'কেউ আমাকে নিজের মেয়ে দিতে রাজি হয় না'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের দুঃখ বুঝতেন নিজের আপন ভাইয়ের মত করে, নিজের সন্তানের মত করে। তিনি তাদেরকে অনুভব করতেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তিনি এই সা'দকে পাঠিয়েছিলেন ইবন আল-ওয়াহহাবের কাছে। সাধারণ কোন ব্যক্তি ছিলেন না ইবন ওয়াহহাব। তিনি হলেন মদীনার নেতাদের একজন; কিছুদিন যাবৎ মুসলিম হয়েছেন। তাঁর মেয়ে অপরূপা সুন্দরী রমণী, রূপের জন্য বিখ্যাত। সেই ইবন ওয়াহহাবের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দকে পাঠালেন।

নেতার মেয়ে বিয়ে করবে সা'দের মতো একজনকে? যে তার সৌন্দর্য্যের জন্য এতো প্রসিদ্ধ, সে হবে সা'দের বউ?? স্বাভাবিকভাবেই ইবন ওয়াহহাবের প্রতিক্রিয়া ছিল 'আকাশ-কুসুম কল্পনা ছেড়ে বাড়ি যাও'... কিন্তু তাঁর মেয়ে ততক্ষণে শুনে ফেলেছে। সে বলে উঠলো, 'বাবা! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরোধ করেছে তাকে বিয়ে করার জন্যে, তুমি কিভাবে উনাকে ফিরিয়ে দিতে পারো?

রাসূলের উৎকণ্ঠা থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আমাদের অবস্থানটা কি হবে?" এরপর সা'দের দিকে ফিরে বললো, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেয়ে বলে দিন, আমি আপনাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তুত'

সা'দের মন সেদিন আনন্দে পুলকিত... সে যেন খুশিতে টগবগ করে ফুটছে... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০০ দিনার মোহরানায় তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! সুবহান আল্লাহ!

সা'দ বললেন, হে রাসূল, আমি তো জীবনে কোনদিন চারশ দিনার দেখিই নি! আমি এই টাকা কীভাবে শোধ করবো? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আলী আল-নু'মান ইবন আউফ আর উসমান রাযি. এর কাছ থেকে দুইশ দুইশ করে মোট চারশ দিনার নিয়ে নিতে। দুজনেই উনাকে দুইশর-ও বেশি করে দিনার দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! টাকার জোগাড় ও হয়ে গেলো। এখন নতুন বউ এর কাছে যাবেন সা'দ রাযি. ...

মার্কেটে যেয়ে সুন্দরী বউ এর জন্যে টুকিটাকি কিছু উপহার কেনার কথা চিন্তা করলেন তিনি। মার্কেটে পৌঁছে গেছেন, হঠাৎ তাঁর কানে আসলো জিহাদের ডাক।

'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও' ... সা'দ যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকালেন একবার, বললেন- 'হে আল্লাহ! আমি এই টাকা দিয়ে এমনকিছু কিনবো যা তোমাকে খুশি করবে।' নতুন বউ এর জন্য গিফট কেনার বদলে তিনি কিনলেন একটি তরবারি আর একটি ঘোড়া। এরপর ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন জিহাদের ময়দানে, নিজের চেহারাটা কাপড় দিয়ে মুড়ে নিলেন, যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে চিনে ফেলতে না পারেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখলেই তো বাড়িতে পাঠিয়ে দিবেন! সে যে সদ্য-বিবাহিত! সাহাবারা রাযি. বলাবলি করছিলেন, যুদ্ধ করতে আসা এই মুখ-ঢাকা লোকটি কে? আলী রাযি. বললেন, 'বাদ দাও, সে যুদ্ধ করতে এসেছে।' ক্ষিপ্ততার সাথে সা'দ যুদ্ধ করতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়ায় আঘাত হানা হলো, ঘোড়া পড়ে গেলো। সা'দ উঠে দাঁড়ালেন। ঐ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কালো চামড়া দেখে ফেললেন, 'ইয়া সা'দ এ কি তুমি?!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশ্নের জবাবে তিনি রাযি. বললেন 'আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক ইয়া আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আমি সা'দ'

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে সা'দ, জান্নাত ছাড়া তোমার জন্য আর কোন আবাস নেই।' সা'দ রাযি. আবারো জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু সময় পর কয়েকজন বললো সা'দ আহত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুটে গেলেন ময়দানে। সা'দকে খুঁজতে লাগলেন। সা'দের মাথা খানা নিজের কোলের উপর রেখে কাঁদতে শুরু

করলেন। তাঁর অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে সা'দের মুখের উপর এসে পড়ছিলো। তাঁর (সা) চোখ বেয়ে নেমে আসছিলো অঝোর ধারা। একটু পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে শুরু করলেন, আর তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবু লুবাবা রাযি. নামের একজন সাহাবা উনাকে দেখে বিস্ময়ে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনাকে এমনটি কখনো করতে দেখি নি'... আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি কাঁদছিলাম কারণ আমার প্রিয় সঙ্গী আজ চলে গেলো! আমি দেখেছি সে আমার জন্য কী ত্যাগ করলো আর সে আমাকে কতো ভালোবাসতো... কিন্তু এরপর আমি দেখতে পেলাম তার কী ভাগ্য, আল্লাহর কসম, সে ইতিমধ্যে হাউদে পৌঁছে গেছে।' আবু লুবাবা জিজ্ঞেস করলেন 'হাউদ কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটি হলো এমন এক ঝর্ণা যা থেকে কেউ একবার পান করলে জীবনে আর কোনদিন পিপাসার্ত হবে না, এর স্বাদ মধুর চেয়েও মিষ্টি, এর রঙ দুধের চেয়েও সাদা! আর যখন আমি তাঁর এইরূপ মর্যাদা দেখলাম, আল্লাহর কসম, আমি হাসতে শুরু করলাম।'

'তারপর আমি দেখতে পেলাম সা'দের দিকে তাঁর জান্নাতের স্ত্রীগণ এমন উৎফুল্ল ভাবে ছুটে আসছে, যে তাদের পা গুলো বের হয়ে পড়ছে, তাই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।'

নবীজি অতঃপর সাহাবাদের কাছে এসে বললেন সা'দের ঘোড়া আর তরবারি নিয়ে আসতে, সেগুলো যেন সা'দের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে যেন বলা হয় এগুলো তার বংশধর। তিনি (সা) বললেন, তাকে জানিয়ে দিও আল্লাহ তা'আলা সা'দকে জান্নাতে স্ত্রী দান করেছেন, তারা তার চাইতেও অনেক সুন্দর। এই হলো সা'দ, যিনি কিছুক্ষণ আগেও অনিশ্চিত ছিলেন যে সে জান্নাতে যেতে পারবে কী না। সমাজে তার কোন মর্যাদা ছিল না, কোন স্ট্যাটাস ছিল না, কিন্তু আল্লাহর চোখে এই হলো তাঁর স্ট্যাটাস। কারণ তাঁর জীবন এবং মরণ ছিলো শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে...।

'নিঃসন্দেহ আমার নামায ও আমার কুরবানি, আর আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক' [সূরাহ আন'আমঃ আয়াত ১৬২]

'নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মুমিনদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক সত্যনিষ্ঠ? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এটিই হচ্ছে মহা সাফল্য। [সূরাহ আত-তাওবাঃ আয়াত ১১১]

সা'দের জীবনকাহিনী শুনে এ দু'টি আয়াতই মনে পড়ে যায়... আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কবুল করে নাও! আমীন...।

আমাদের মায়েরা কি এমন হতে পারে না?

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও তাঁর মায়ের পত্রালাপ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর মার প্রতি একটি চিঠি প্রেরণ করেন- যে চিঠিতে তিনি তাঁর মা থেকে কিছু দিন দূরে থাকার কারণে ক্ষমা প্রর্থনা করেছেন, অনুপস্থিতির এই দিনগুলো তিনি দীনি দাওয়াত এবং অন্যান্য দীনি কাজে মিসরে অবস্থান করছিলেন। তাঁর মার নিকট যখন উক্ত চিঠিটি পৌঁছলো, তখন তাঁর মা প্রতি উত্তরে লিখে পাঠালেন-

আমার কলিজার টুকরো আহমদ ইবনে তাইমিয়া!

وعليك السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته و رضوانه.

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি এখন যা করছ এর জন্যই আমি তোমাকে প্রতিপালন করেছি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতের জন্যই আমি তোমাকে উৎসর্গ করেছি আর দীনি ইলমই তো আমি তোমাকে শিখিয়েছে।

তুমি কখনো একথা মনে করনা যে, আমার প্রতি তোমার নৈকট্য দীনের প্রতি তোমার নৈকট্য থেকে আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর তুমি জেনে রেখ- দুনিয়ার আনাচে-কানাচে তুমি ইসলাম এবং মুসলমানদের খেদমত করবে এটা আমার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়। প্রিয় বৎস! তুমি জেনে রেখ! তুমি আমার ততটুকু সন্তুষ্টিই পাবে- ইসলাম এবং মুসলমানদের খেদমতে তুমি নিজেকে যতটুকু উৎসর্গ করবে।

হে আমার প্রিয় বৎস, তুমি আরো জেনে রেখ! রোজ কেয়ামতে আমি আল্লাহর দরবারে তুমি আমার থেকে দূরে থাকার কারণে কোন প্রকার অভিযোগ করবো না। কেননা আমি জানি তুমি কোথায় আছ এবং সেথায় তুমি কী করছ। (তিনি তখন জিহাদের দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।)

তবে আমি অবশ্যই আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবো এবং তোমার কাছ থেকে হিসাব নিব যদি তুমি আল্লাহর দীন এবং এর অনুসারী তোমার মুসলিম ভাইদের খেদমতে কোন প্রকার ত্রুটি করে থাক।

আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তোমার সকল যোগ্যতাকে কল্যাণের নূরে আলোকিত করুন এবং তোমার সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং তোমাকে তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দিন- যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতিত আর কোন ছায়া থাকবে না।

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته.



আপনার জিজ্ঞাসা ও আমাদের জবাব

প্রশ্ন: *গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষকে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে। এটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?*

উত্তর: গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা মানুষকে এই স্বাধীনতা দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে জীবনব্যবস্থা এবং সংবিধানকে নিজেদের জন্য পছন্দ করবে সেটিই তাদের সংবিধান হিসাবে গণ্য হবে। তারা যা ইচ্ছা হালাল করবে, আর যা ইচ্ছা হারাম করবে। আর প্রকৃত সাংবিধানিক রাষ্ট্র সেটিকেই বলা হবে যাতে দেশের জনগণের আইন প্রণয়নের অধিকার পূর্ণভাবে রয়েছে। আর যদি কোন রাষ্ট্র জনগণের এই অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান না করে, তাহলে গণতন্ত্রের ভাষায় সে দেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলার উপযুক্ত থাকে না। সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে অংশিদার মানা সর্বসম্মতভাবে কুফুরী। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে শুধু শরীকই মানা হয় না; বরং (নাউযুবিল্লাহ!) আল্লাহ তাআলার এই একক অধিকারকে কেবলমাত্র পার্লামেন্টের হাতে প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা স্পষ্ট অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং তা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾

অর্থ: 'এবং আল্লাহ তাঁর হুকুমের মধ্যে (আইনের মধ্যে) কাউকে শরীক করেন না।' (সূরা কাহাফ, আয়াত ২৬)
ইমাম বাগাবী রহ. বলেন, ইবনে আমের এবং ইয়াকুব রহ. এই আয়াতের দ্বিতীয় কেরাত বর্ণনা করেছেন এভাবে,

﴿ وَلَا تُشْرِكْ فِيْ حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾

অর্থ: 'আল্লাহর হুকুম বা আইনের মধ্যে তোমরা কাউকে শরীক করবে না।' (তাফসীরে বাগাবী, পঞ্চম খন্ড)
কেননা, মানব জীবনের আইন প্রণয়ন করা কেবল ঐ সত্তার জন্য নির্দিষ্ট যিনি এই নিখিল জগত সৃষ্টি করেছন। উভয় জগতের মালিক তাঁর পবিত্র কিতাবে ঘোষণা করেন,

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾

অর্থ: 'শুনে রাখ! সৃষ্টি এবং হুকুম প্রদানের (আইন প্রণয়নের) গুণ একমাত্র আল্লাহরই জন্য।' (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৫৪)
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ফক্বীহ এবং মুফাস্সির ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ.বলেন,

أَلاَ لَهُ الخلق والامر: ألا كلمة التنبيه ، يعني : اعلموا أن الخلق لله تعالى ، وهو الذي خلق الأشياء كلها وأمره نافذ في خلقه.

অর্থাৎ **ألا** শব্দটি সতর্কসূচক অর্থাৎ, হে মানবজাতি! তোমরা জেনে নাও যে, সৃষ্টিগুণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই, তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর আইনই/আদেশই তাঁর সৃষ্টির মাঝে বাস্তবায়িত হবে।' (তাফসীরে বাহরুল উলূম, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৭)

অর্থাৎ এই আয়াতের মধ্যে **ألا** শব্দটি সর্তককরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল, তোমরা জেনে নাও যে (খালক) সৃষ্টি করার গুণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি একমাত্র ঐ সত্তা যিনি পৃথিবীসহ সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁরই আদেশ এবং আইন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবায়িত হবে।

ইমাম নিশাপুরী রহ.বলেন, এই আয়াত একথারই দলীল যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো এই অধিকার নেই যে, সে অন্যের ওপরে নিজের পক্ষ থেকে কোন বিষয় আবশ্যকীয় করবে। (তাফসীরে নিশাপুরী, ২য় খন্ড)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ تفسير رازي তে একথাই বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ তাআলাই আইন এবং বিধান প্রণয়নকারী। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এই দু'য়ের মধ্য থেকে কোন একটি গুণ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সাব্যস্ত করে, সে যেন তার যবানে পঠিত কালেমা لا إله إلا الله কে অস্বীকার করে। যদি কোন ব্যক্তি কবরের কাছে গিয়ে কোন কিছু চায় এবং বলে, হে পীর! আমাকে বাচ্চা দান করুন। অথবা কোন ব্যক্তি যদি নিজের সন্তানের ব্যাপারে একথা বলে যে, আমার এই সন্তান অমুক পীর দান করেছে, তাহলে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মুশরিক বলে দেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে, অমুক আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে, অথবা একথা বলে যে, আইন তৈরী করা পার্লামেন্টের অধিকার/কাজ, তাহলে কি আপনি তার এ কথাকে শিরিক বলতে এজন্যই বিরত থাকেন যে, এই ব্যক্তি প্রভাবশালী, কিংবা শাসক গোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে 'সৃষ্টি করার গুণের মতো আইন প্রণয়নের গুণকে নিজের বিশেষত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। আইন প্রণয়ন একমাত্র আল্লাহ তাআলার অধিকার। পৃথিবীর অন্য কারো এ অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন আইন বানাবে এবং কোন বস্তুর বৈধ অবৈধ বা সাংবিধানিক অসাংবিধানিক হওয়ার হুকুম আরোপ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئًا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه،
لقوله: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)

অর্থ: 'যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করল যে, আল্লাহ তাআলা الأمر বিধান তৈরীর কিছুটা অধিকার বান্দাদের দিয়েছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে সে কুফুরী করলো ঐসমস্ত বিষয়ের সাথে যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদেরকে পাঠিয়েছেন।' (তাফসীরে তাবারী, খন্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৮৪)
কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

অর্থ: 'শুনে রাখ! সৃষ্টি এবং হুকুম প্রদানের অধিকার (আইন প্রণয়নের গুণ) একমাত্র আল্লাহরই জন্য। তিনি পবিত্র ও সুমহান, সমগ্র বিশ্বের রব।' (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৫৪)

আল্লাহ তাআলার সাথে এর চেয়ে বড় কুফুরী আর কী হতে পারে যে, যে সিফাত আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট তা আল্লাহ তাআলা থেকে নিয়ে মানুষকে দেয়া হয়েছে এবং মানুষকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ করা হয়েছে।

আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন, নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা কাউকে এ অধিকার দেননি যে, সে কোন বিষয়ের ব্যাপারে জায়েয নাজায়েয বা বৈধ অবৈধের ফায়সালা করবে, এমন কি কোন নবীকে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এই অধিকার দান করেননি যে, তিনি আল্লাহর হুকুম ব্যতীত নিজের পক্ষ থেকে কোন বস্তুকে হালাল অথবা হারাম সাব্যস্ত করবেন।
এরপর আর কার জন্য এটি বৈধ হতে পারে যে, সে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের পক্ষ থেকে আইন তৈরী করবে এবং ঐ সব বিষয়গুলোকে বৈধ করে দিবে যেগুলোকে সকল বিচারকের বিচারক কিয়ামত অবধি তাঁর অমর সংবিধান কুরআনে নাজায়েয করেছেন। অথবা এমন কোন বিষয়কে অবৈধ বলে তার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে, যা তিনি পালনের জন্য স্বীয় বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন।

আরব বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, শায়খ সফর ইবনে আব্দুর রহমান হাওয়ালী রহ. شرح عقيدة الطحاوية এর মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

وفي هذه الآية دليل عَلَى أنه لا يجوز لأحد غير الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن يشرع للناس بأي حال من الأحوال، فالشرع المتبع إنما هو شرع الله ودينه، لأن الله تَعَالَى هو الذي خلق الخلق، فكيف يكون له الخلق ويكون لغيره الأمر والنهي؟ شرح عقيدة الطحاوية, الجزء الأول, باب الشفاعة, لسفر بن عبد الرحمن الحوالي

অর্থ: 'আর এই আয়াতে এ কথার দলীল রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোন অবস্থাতেই মানুষের আইন প্রণয়ন করার বৈধতা নেই। যে শরীয়তের অনুসরণ আবশ্যকীয়ভাবে করতে হবে তা হলো আল্লাহর শরীয়ত এবং দীন। আর এটি এজন্য যে, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, খালেক হওয়া তাঁর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে আর আদেশ-নিষেধের বিষয় অর্থাৎ আইন প্রণয়নের অধিকার অন্যের জন্য থাকবে।' (শরহে আক্বীদাতুত ত্বহাবী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮১)

বিষয়টিকে পাঠক একটি উপমার মাধ্যমে সহজে বোঝতে পারবেন। (আল্লাহ তাআলা উত্তম উপমা দানকারী) যেমন, এক ব্যক্তি একটি গাড়ি আবিষ্কার করল। তাহলে এই গাড়ি চালানোর পদ্ধতিও তিনিই বলে দিবেন যে, এভাবে কর ওভাবে করবে না, গাড়ি চালাতে এক্সেলেটার চাপ দিতে হবে আর গাড়ি থামাতে ব্রেক কষতে হবে। সুতরাং যেই চালক আবিষ্কারকের বাতলে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিজের মতো করে গাড়ি চালালো যেখানে ব্রেক করতে হবে সেখানে এক্সেলেটার চাপলো, গাড়ি সামনে নিতে রিভারস্ গিয়ার চাপলো এবং ডান দিকে মোড় নিতে স্টিয়ারিং বাঁ দিকে ঘুরালো তাহলে এমন চালকের ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে? স্পষ্ট যে এমন ব্যক্তি গাড়ির অস্তিত্বও শেষ করবে এবং আরোহীদেরকেও পিষে মেরে ফেলবে। এজন্য জন-নিরাপত্তার স্বার্থে এমন আনাড়ি ব্যক্তিকে বল প্রয়োগ করে গাড়ি থেকে নিচে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই যখন এই নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা তখন তাতে তাঁরই বাতলানো পদ্ধতিতে শাসন পরিচালিত হবে।

আর আল্লাহ তাআলার এই বাতলানো পদ্ধতিকেই জীবনব্যবস্থা ও সংবিধান বলে। যদি তাঁর বাতলানো জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা এবং সংবিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা হয় তাহলে চতুর্দিক থেকেই ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা খোদাদ্রোহী এমন আনাড়িদেরকে চালকের আসন তথা বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে সরানোর জন্য মুসলিম জাতির ওপর জিহাদ নামক ইবাদত ফরজ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন এ জিহাদ বিশ্বজাহানের জন্য রহমত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾

অর্থ: 'আর যদি আল্লাহ তাআলা কতকের (মুসলিমদের) দ্বারা কতককে (কাফিরদেরকে) প্রতিহত না করতেন তাহলে এই ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীর ওপর অনুগ্রহশীল।' (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫১)

তাই তিনি জিহাদের মাধ্যমে এই প্রতিহত ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা করেছেন। এখন যে সব লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবী পরিচালনার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন তাদের দায়িত্ব হল তারা এসব আনাড়িদেরকে কিতালের শক্তির মাধ্যমে হটিয়ে বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে।

শায়েখ সফরুল হাওয়ালী আরেকটু সামনে বেড়ে বলেন,

وهذا ما فعله النَّاس في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية في كل زمان ومكان، يؤمنون بأن الله له الخلق، ولكن يجعلون لغيره الأمر، فيشرعون ويسنون القوانين، ويحلون ما يشاءون، ويحرمون ما يشاءون، وهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وهو حقيقة الطاغوت الذي أمر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن يكفر به، ولا يكون الإِنسَان مؤمناً إلا إذا كفر بالطاغوت الذي يشرع من دون الله تعالى..." شرح عقيدة الطحاوية, الجزء الأول, باب الشفاعة, لسفر بن عبد الرحمن الحوالي

অর্থ: 'প্রাচীন বর্বর যুগে এবং প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক অঞ্চলের বর্বর লোকেরা এমনটাই করতো যে, খালেক হিসাবে তো আল্লাহ তাআলাকেই মানতো, কিন্তু জীবন সংবিধান তৈরীর অধিকার আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করত। তারা নিজেরা আইন তৈরী করত, সংবিধান বানাতো যা ইচ্ছা হারাম করত এবং যা ইচ্ছা হালাল করত। অথচ এমনটি করা শিরকে আকবর বা বড় শিরিক, যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। একজন মানুষ তখন পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে এমন তাগুতের সাথে বিদ্রোহ করে যে আল্লাহ তাআলার মোকাবেলায় বান্দাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে।' (শরহে আক্বীদাতুত ত্বহাবী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮২)

উপরের আলোচনা থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হয় তা হল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত আল্লাহ তাআলার সিফাতে হাকিমিয়্যাহকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। বিধানদানের ক্ষমতা মহান আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের হাতে অর্পণ করেছে। তাই যে ব্যবস্থার সৃষ্টিই ইসলামকে খর্ব করা, শরীয়াহকে অকেজো প্রমাণিত করা। কীভাবে সম্ভব সে পথ অবলম্বন করে শরীয়াহ বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখা। আল্লাহ তাআলা গণতন্ত্রের এ সর্বগ্রাসী ফেতনা থেকে উম্মতে মুসলিমাকে পরিত্রাণ দিন। আমীন।



কারা কিসের জন্য লড়াই করছে?

-মাওলানা আসেম ওমর

ঈমানদাররা শরীয়ত বাস্তবায়নের (খিলাফতের) জন্য লড়ছে, আর যারা এই শরীয়তকে বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বা এর বিরোধিতা করছে তারা শয়তানের পথে লড়ছে।

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾

অর্থ: 'যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর রাস্তায় ক্বিতাল করে, আর যারা কুফুরী করেছে তারা তাগুতের পথে ক্বিতাল করে। অতএব, (হে মুমিনরা!) তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে ক্বিতাল করো, নিশ্চয়ই শয়তানের কুটনীতি অনেক দুর্বল।' (সূরা নিসা, আয়াত ৭৬)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতে কারা কিসের জন্য লড়ছে তার স্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। যে এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁর নাযিলকৃত আইন-কানুনগুলো সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে, অতঃপর যেই মহান সত্তার ওপর তা নাযিল করা হয়েছে তাঁর ওপরও ঈমান এনেছে, তার পক্ষে এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, সে ইসলামী অনুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ক্বিতাল করবে না?

সুতরাং যার অন্তরে ঈমান আছে, সে অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় ক্বিতাল করবে। অনুরূপ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ ও ইলাহ বানিয়ে রেখেছে, আল্লাহর জীবনব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন সংবিধান মেনে নিয়েছে, সেও তাগুতের সংবিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবশ্যই কাজ করবে।

এই আয়াতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, যারা তাগুতের জন্য ক্বিতাল করে তারা কাফের। অতএব, বর্তমান বিশ্বে চলমান সন্ত্রাসবাদের যুদ্ধের ব্যাপারে আর কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যে যে ধর্মকে মানে সে তার জন্য যুদ্ধ করছে। যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আনীত জীবনব্যবস্থার ওপর ঈমান এনেছে, এছাড়া অন্য সব ধর্মকে বাতিল মনে করে; সে শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য ক্বিতাল করছে। আর যারা শরীয়তের বাস্তবায়ন চায় না, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত বাস্তবায়নের মাঝে নিজেদের ধ্বংস ও মৃত্যু দেখতে পায়। যার কারণে তারা নিজেদের রচিত জীবনব্যবস্থার জন্য লড়ে যাচ্ছে। উভয় দলের (শরীয়াহর পক্ষে লড়াইকারী এবং এর বিপক্ষে লড়াইকারী) ভাষ্যগুলো যদি ভালোভাবে দেখা হয় তাহলে এ যুদ্ধের বাস্তবতা উপলব্ধি করা আরো সহজ হতে পারে। কাফের দেশ হোক বা মুসলিম দেশ হোক উভয় দলের চাল-চলন, তৎপরতা, শ্লোগান ও দাবীর মাধ্যমে এবং জীবন চলার গতি ও ধরণ দেখে যে কোন আমানতদার মানুষ বলে দিতে পারবে, কারা কিসের জন্য লড়াই করছে?

বাংলাদেশ হোক বা পাকিস্তান, আফগান হোক বা ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন হোক্ কিংবা মিশর বা পশ্চিমা ইসলামী বিশ্ব সব জায়গায় يقاتلون في سبيل الله বা আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারীগণের শ্লোগান, দাবী ও লাইফস্টাইল একই ধরণের।

অতএব কে সত্যের ওপর আছে আর কে মিথ্যার ওপর রয়েছে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনাই বর্তমানে অনর্থক। এখন তো তাগুতের ঝাণ্ডাধারীরাও জানে যে, মুজাহিদীনরা কী জন্য লড়ছেন? তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী?

আর তারা এটাও ভালোই জানে যে, তাদের এ যুদ্ধ কেবল আফগানিস্তান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। তাওহীদেও পতাকাবাহীরা জেগে ওঠবে চারিদিকে।

সুতরাং যারা এ উম্মাহকে জিহাদ থেকে বিরত রেখে কাফেরদের সাথে সদাচরণ ও তাগুতের সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার সবক দিচ্ছে, নসীহত করছে অবশ্যই তাদের নিরাশ হতে হবে। উম্মতে মুসলিমা যে জিহাদকে শাহাদাত ও সুসংবাদের ভূমি আফগানিস্তানে শিখেছিল, আজ সে জিহাদ তার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, সুদখোর ইহুদীদের বানানো জীবনব্যবস্থা মুজাহিদের বন্দুকের সামান্য আঘাতেই মুখ থুবড়ে পতনোম্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

অন্যদিকে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে জাগরণের যেই ঢংকা বেজে ওঠেছে তা খিলাফাত-শাসন ব্যতীত অন্য কোনো তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে থামানো যাবে না। ইসলামী খিলাফতের মাধ্যমেই বাকি সব শাসনতন্ত্রের কবর রচিত হবে এবং একদিন ইনশাআল্লাহ খিলাফত অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ উম্মাহকে আর ইবলিসের রচিত সংবিধান, দাজ্জালের আজ্ঞাবহদের বুলি আর অন্তসারশূন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। ধোঁকাবাজির দিন শেষ। উম্মাহর এই জাগরণের চূড়ান্ত মনজিল খিলাফত। আমাদের রক্ত ও শাহাদাতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে- খিলাফত আলা মিনহাজিন্ নবুয়্যাহ ইনশাআল্লাহ!!

সুতরাং উলামায়ে হক্বের প্রতি আমাদের নিবেদন, জিহাদকে গতিশীল করার জন্য, জিহাদকে শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমায় পরিচালিত করার জন্য এবং ভবিষ্যত খিলাফতকে পরিশুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের জিহাদের ময়দানে আসার বিকল্প নেই। মুজাহিদীনদের নেতৃত্ব দিতে হবে উলামায়ে কিরামকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই বিশ্ব কুফুরী শক্তি আল্লাহর ইচ্ছায় আর বেশী দিন মুজাহিদীনদের মোকাবেলা করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা এ উম্মাহকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন এবং তাবৎ কুফুরীশক্তি চরম লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের শিকার হবে।

অনুরূপভাবে সাধারণ মুসলমানদেরও মুজাহিদীনদের কাতারে শামিল হওয়া চাই। শয়তানের ফাঁকা আওয়াজ, মিডিয়ার অসার প্রচারণায় খিলাফত কায়েমের জন্য নিজেদের জান, মাল ও জবান সবই আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা মুজাহিদীনদের ওপর শুধু নয়, প্রত্যেক মুসলমানের ওপরও ফরজ। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের সবচেয়ে বেশী ভূমিকা থাকা চাই। তাঁরা সাধারণ লোকদেরকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিবেন এবং খিলাফতের পথে বাধা দানকারী শক্তিগুলোর শরঈ বিধান খুলে খুলে বয়ান করবেন।

প্রচলিত ব্যবস্থার কারণে মুসলমানগণ না পারছে সুদ থেকে বাঁচতে, না কোন ব্যবসায়ী তার ব্যবসা হালালভাবে টিকিয়ে রাখতে পারছে, আর না কোন কৃষক নিজের জমি থেকে কিছু উপার্জন করতে পারছে।

মজুরদের কর্মসংস্থান সংকট যেমনি বাড়ছে তদ্রুপ বেকারত্ব সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। ন্যায়বিচারের আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। এই কুফুরী জীবনব্যবস্থা মানব সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এ জীবনব্যবস্থা মুসলমানদের কিছু দিয়ে থাকলে তা হলো- আত্মহত্যা, গণকবর, লাশের মিছিল, বসত-ভিটার জ্বলন্ত অঙ্গার আর উম্মাহর কন্যাদের গ্রেপ্তার করে ছিয়াশি বছর কয়েদখানায় ফেলে রাখা। যেখানে স্বজাতীয় দেড়শ কোটি মানুষ ভাবলেশহীন এই জীবনব্যবস্থায় নির্লজ্জতার ব্যাপকতা ঘটে, অশ্লীলতার ছড়াছড়ি হয়। সস্তা ও মেকি সৌন্দর্য সহজলভ্য হয় ও আত্মমর্যাদাহীনতার প্রসার ঘটে। এই জীবনব্যবস্থা জুলুমকে আর্ট বা শিল্প হিসেবে তুলে ধরে, ধর্মহীনতাকে ‘লজিষ্টিক সাপোর্ট দেয়, ঈমান বিক্রি এবং খোদাদ্রোহীতার বিনিময়ে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করায়।

তাই আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, এ লড়াই জীবনব্যবস্থা ও সংবিধানের লড়াই। আমরা এ কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী যে, আমরা ও আমাদের সারা বিশ্বের সকল সাথীরা কারও সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা, রাজনৈতিক, কুটনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধ করছি না; বরং এ জন্যই লড়াই করছি যে, আল্লাহর সব সৃষ্টি যেন আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আল্লাহর যমীনে যেন আল্লাহর কুরআন সংবিধান হিসেবে বাস্তবায়িত হয়।

আমরা এ কথাও স্বীকার করে নিচ্ছি যে, আমাদের শত্রুপক্ষও (বিশ্ব পুঁজিবাদী ঐক্য পরিষদ) নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে স্পষ্ট অবস্থানে আছে। তারাও এ জন্য যুদ্ধ করছে যেন বিশ্বে ইবলিসের রচিত এই গণতন্ত্র বিশ্ব অর্থনীতি এবং ইবলিসী জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। যেন মানুষ আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে ইবলিসের ইবাদত করতে থাকে। দুনিয়ার কোন একটি এলাকায়, এমনকি কোনো পাহাড় বা পাহাড়ের গুহায়ও যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত জীবনব্যবস্থা কায়েম না হয়, কারণ এতেই যে ইবলিসের মৃত্যু নিহিত রয়েছে।

অতএব, হে আমার মুসলমান যুবক ভাইয়েরা! এই যুদ্ধ ইসলাম ও কুফরের। এই লড়াই মুহাম্মদী মিশন ও ইবলিসী সংবিধানের। এই যুদ্ধ হলো লাইফস্টাইলের। হ্যাঁ এ যুদ্ধ লাইফস্টাইল ও জীবনব্যবস্থার।

বলুন! পৃথিবীটা কিভাবে চালানো হবে, কোর্ট-কাচারীর আইন কেমন হবে? অর্থনীতির রূপ কেমন হবে? যার দ্বারা শুধু মুসলমানই নয়; বরং একজন গরীব কাফেরও তার ন্যায্য প্রাপ্য সে বোঝে পাবে।

এসব কে ভালো বলতে পারবে? সে যে নিজের মা'কে ফায়দা লুটার জন্য বিক্রি করে? যে নিজের কন্যাদেরকে ইবলিসী মিশনের অগ্রগতির জন্য উপস্থাপন করে?

নাকি সে? যে এ উম্মাহর শান্তির জন্য সর্বপ্রকার বিষাদকে বরণ করে নেয়। যে এই উম্মাহর শান্তির জন্য সব নিজের দেহকে ঝাঁঝড়া করে দিতেও কার্পণ্য করে না!

নিজেই ফায়সালা করুন! ইবলিসের বানানো সংবিধান অনুযায়ী মানুষ জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে, নাকি আল্লাহর রচিত শরীয়ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারে?

সাবধান!

ধোঁকা খাবেন না। মিডিয়ার অপপ্রচারে কান দেবেন না।

আপনি তো মুসলমান। আপনার জবান কাফেরদের পক্ষে চলতে পারে না, আপনার সহায়তা ইবলিস দাজ্জালের জন্য হতে পারে না। একদিকে আপনি মুসলিম হবেন, অপর দিকে ইবলিসের বাহিনীকে সাহায্য ও সহমর্মিতা জানাবেন এটা কিভাবে হতে পারে?

কিয়ামতের দিন আপনি কী উত্তর দিবেন? কিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাড়াবেন?

মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেকের কাতারে তাকে কিভাবে শামিল করা যেতে পারে? যার কথা আমেরিকা বা তার শক্তির পক্ষে সহায়ক হয়েছে -একটি হলেও!

এগুলো ধোঁকা, বিশ্বাসঘাতকতা, চোগলখুরী...। আল্লাহর ওয়াস্তে এমন চোগলখুরীতে পা দিবেন না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ জমানায় শয়তান মানুষের সুরতে এসে ওয়াজ-নসীহত করবে। অতএব, তোমরা তার সার্বিক অবস্থা জেনে নিবে।

টিভিতে চাপাবাজি কারা করছে? কেউ শিয়া, কেউ কাদিয়ানী, কেউ আবার পারভেজী বা কোন নাস্তিক কিংবা নতুন কোন মুরতাদ বা কোন যিন্দিক। কেউ ইরানে পড়েছে বা দুই বছর ইসরাইলে থেকে এসেছে। কেউ ডেনমার্কের কুটনৈতিক সংস্থা থেকে সহায়তা নিচ্ছে। কেউ বা আমেরিকায় গিয়ে ইহুদীদের সেজদা করে এসেছে। কারো সন্তান আমেরিকার গ্রীণকার্ডের জন্য কাফেরদের কুকুর গোসল করাচ্ছে। কেউবা ব্রিটেন আমেরিকার ভিসার জন্য ‘মাসলাহাত’ নামে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে হক্ব ও বাতিলকে কলম দ্বারা গড়বড় করে ফেলছে। কারও গুরু ওহীদুদ্দীন খান, আবার কেউ গামেদীর খলীফা হয়ে বসে আছে।

আল্লাহর ওয়াস্তে ধোঁকা খাবেন না। বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। নিজেকে ঈমানের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে ধোঁকা খাবেন না। কেননা বিষয়টি ঈমান ও কুফরের। ব্যাপারটা আখেরাতের। সেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না। এক পথভ্রষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্য ধ্বংসপ্রাপ্তকে তিরস্কার করবে; কিন্তু কোনো লাভ হবে না।

ওয়ায়েজীন, মোবাল্লিগীন, নেতা-নেত্রীরা সেদিন হতবিহ্বল হয়ে পড়বে। সোজা উত্তর দিয়ে দিবে, 'তোমাদের ওপর আমাদের কোন ক্ষমতা চলেনি, তোমরাই হীন ছিলে, তোমাদের মানসিকতা ছিলো অতি নীচ।'

আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

আসুন আমরা নীচু মানসিকতা, অন্তরের বক্রতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। নিচু মানসিকতা দূর করার উত্তম পন্থা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। গাফিলতি অনেক হয়েছে, এখন আর দেরী করার সময় নেই।

ইমাম মাহদী আসবে তখন জিহাদ করবো এ ধোকায় পড়বেন না যেন। কুরআনেও এই ধোঁকাকে নিচু মানসিকতা বা অন্তরের রোগ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾

অর্থ: 'যদি তারা আসলেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা করতো, তাহলে কিছু প্রস্তুতি হলেও নিতো।' (সূরা তাওবা, আয়াত ৪৬)

অতএব, জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে নিন। জিহাদ যেসব আসবাবের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে তার প্রস্তুতিও প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

ইমাম মাহদী আ. এর সময় অস্ত্র কী হবে, তা দেখা আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। আমাদেরকে এটাই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কী করে এসেছ?

আচ্ছা আসুন, আপনার কথাই মেনে নিলাম যে, ইমাম মাহদীর সময়ে ক্লাশিনকোভ থাকবে না তা শিখে লাভ কী!

তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করবো, তরবারী চালনা শিখেছেন কি?

চার পাঁচ কেজি ওজনের তরবারী হাতে নিয়ে কতক্ষণ ঘুরাতে পারবেন? এক হাতে তরবারী, আরেক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে কত সময় যুদ্ধ করতে পারবেন? কঠিন গরমে উত্তপ্ত মরুভূমিতে কতোদিন পায়ে হেঁটে চলতে পারবেন? কঠিন তুষারপাতের সময় পাহাড় থেকে শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা বা অনুশীলন কখনো করেছেন কি? কখনো রক্তে রঞ্জিত জিহাদের ময়দান টিভির স্ক্রীণ ছাড়া বাস্তবে দেখেছেন কি?

হে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসীরা!

এগুলো তো এমন কথা, যে জিহাদ করে সে এগুলো নিয়ে ভাবে না যে, আগামীকাল ক্লাশিনকোভ পাবো কি পাবো না?

তারা তো এটাই দেখেন যে, আজ তাদের প্রভূ তাদের জন্য কী হুকুম দিয়েছেন? তাদের ওপর ফরয কী?

তারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর পথে বিক্রি করে দিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, নিজের আসল বন্ধুর দিদারের আশায়, নিজ প্রভূর সাক্ষাতের তামান্নায়; নিজের মালিকের সাথে তারা বিক্রয় চুক্তি করে ফেলেছেন। লাভজনক চুক্তি। আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য দেরী যেন না হয়ে যায়। দোজাহানের বাদশাহ যেন এই ঘোষণা করে না দেন যে,

﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾

অর্থ: 'নিশ্চয়ই তোমরা তো প্রথমবার জিহাদ থেকে সরে থাকার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলে, অতএব তোমরা পেছনে পড়ে থাকা ব্যক্তিদের সাথেই থেকে যাও।' (সূরা তাওবা, আয়াত ৮৩)

কারও পেছনে পড়ে থাকা, আল্লাহর জিহাদকে কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তাই জেগে ওঠো হে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার যুবকেরা! জেগে ওঠো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতের দাবীদারেরা!

যে প্রিয়নবীর ভালোবাসার দাবী করো তার জীবন বিধানের জন্য বের হয়ে পড়ো। তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থানকারী সংবিধানের রক্ষকরা নিজেদের সংবিধান বাঁচানোর জন্য লড়াই করছে। তারা সবাই জোটবদ্ধ হয়েছে। ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধসহ সকল কুফফাররা ইসলামী শারীয়াহ ও শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। তাদের সাথে এমন কিছুলোক রয়েছে, যাদের মুখে তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালিমা, কিন্তু তাদের অন্তর, তাদের জীবনের গতি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনদের সঙ্গেই।

এরা শয়তানের সংবিধান রক্ষা করার জন্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার অঙ্গীকার করেছে। অতএব তুমিও তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবিধানকে বাস্তব জীবনে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য শপথ নাও! দুনিয়ার বুকে একটাই শ্লোগান ও আওয়াজ তোলো 'হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদাত' আর এতেই যে নিহীত রয়েছে চূড়ান্ত কল্যাণ, সফলতা। আর অনন্ত সুখের পথও যে এটিই।

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله
صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل

কুড়ান মতি

যদি সকল মানুষ আলেমও হয়ে যায়
তথাপি জামাত, শ্রবণ, আনুগত্য,
নুসরাত ও জিহাদ ছাড়া
আল্লাহ্ তাআলার দীন
প্রতিষ্ঠিত হবে না।

-উসামা বিন লাদিন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী

‘মনে রেখো, ইসলামের চাকা ক্রমশ ঘুরছে। সুতরাং তোমরা যেন কোরআনের পথ ভুলে না বস। শোন, কোরআন আর শাসনক্ষমতা অচিরেই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করবে। সাবধান, কোরআন ছেড়ে বসোনা যেন ! ভবিষ্যতে এমন শাসক আসবে যারা তোমাদের উপর ছড়ি ঘোরাবে–যদি তাদের বশ্যতা মেনে নাও, তাহলে নির্ঘাত তারা তোমাদের পথহারা করে ছাড়বে। আর যদি তাদের প্রত্যাখ্যান করো, তবে তারা জমদূত হয়ে হাজির হবে। সাহাবী মুআজ রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন্ পথ ধরবো তা যদি বলে দিতেন? রাসূল সা. বললেন, তোমরা বরং ঈসা আ. এর সহচরদের মতো হয়ে যাও, তাঁরা শুলিতে চড়েছে, জীবন বিপন্ন করেছে; কিন্তু সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়নি।

–তবরানী